Ладо
СК

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

Approved by the Directorate of public Instructions, West Bengal as a children's monthly magazine. Vide No. 109 (16) T. B. C. Dated 15. 3. '73.

কলরব

সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, ভাদ্র ১৩৮০

খোকার সাধ (কবিতা)
অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ৫৮১

ছোট্ট কুমার (ছড়া)
অশোক পোদ্দার ৫৮২

ভুতুড়ে ইয়ার্কি (গল্প)
শিবরাম চক্রবর্তী ৫৮৩

ডেভিড লিভিংস্টোন (প্রবন্ধ)
অমলকুমার মিত্র ৫৯১

কে ? (চিত্র-কাহিনী)
তুষার চ্যাটার্জী ৫৯৬

সোনামাখা দুপুরে (কবিতা)
ধূর্জ্জটীপ্রসাদ দত্ত ৫৯৮

বাহাদুর ছেলে (গল্প)
প্রীতিভূষণ চাকী ৫৯৯

সবুজ সবুজ ঘাসের বনে (ছড়া)
সুনির্মল চক্রবর্তী ৬০০

স্বাধীনতার একটি প্রদীপ
(ঐতিহাসিক ঘটনা)
হাসিরাশি দেবী ৬০১

ছোট্ট পাখি (ছড়া)
কার্তিক ঘোষ ৬০৫

কোথায় আলোর দিশা
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৬০৬

সমুদ্রে শয়তান (অনুবাদ-গল্প)
জ্যাক লণ্ডন ৬০৭

টেনিদার অজলাভ (ধারাবাহিক উপন্যাস)
আশা দেবী ৬১৩

আগামীকাল (অনুবাদ-গল্প)
অনুবাদক কমলেশ সিংহরায় ৬১৮

পদ্মপরী (গল্প)
মুরারীমোহন বিট ৬১৯

কাঠবেড়ালি (কবিতা)
প্রদীপকুমার রায় ৬২২

বিলেতের চিঠি
অভিজিৎ বসু ৬২৩

বোম্বের পথে যাদুকর (গল্প)
রমেশ মজুমদার ৬২৬

আমি যাত্রী : জিনিভা (ভ্রমণ)
সুশীলকুমার গুপ্ত ৬৩৩

ম্যাজিক
যাদুকর এ, সি, সরকার ৬৩৭

খেলাধুলা
মুকুল দত্ত ৬৩৮

ধাঁধা ৬৪১

সম্পাদক/সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ● সহযোগী সম্পাদক/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ● চিত্রশিল্পী/চারু খান

দাম : ৯০ পয়সা

—নিয়মাবলী—

১. কলরবের প্রতি সংখ্যার মূল্য ·৯০ পয়সা। সডাক বার্ষিক চাঁদার হার ১০·৮০ টাকা ও ষান্মাসিক ৫·৪০ টাকা মাত্র। টাকা অগ্রিম না দিলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

২. পত্রিকা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাক টিকিট সহ চিঠি-পত্র, ছবি, ফটো ও রচনা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৩. কলরব-এর বর্ষ অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু নির্ধারিত টাকা পাঠাইয়া অগ্রহায়ণ অথবা যে কোন মাস হইতেও গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবে, মনি অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৪. কলরব-এর গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা, তাদের তোলা ফটো এবং ছবি সম্পাদকের মনোনীত হইলে তাহা সাদরে প্রকাশ করা হইবে

৫. বিশেষ সংখ্যার জন্য পৃথক দাম লাগবে।

কর্মধ্যক্ষ

কলরব

বি-৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-১২

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার কর্তৃক বি-৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রাঙ্কন, ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ দশম সংখ্যা ❋ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ : ভাদ্র, ১৩৮০

খোকার সাধ

অমিয় কুমার সেনগুপ্ত

মা-গো, আমার ইচ্ছে বড়ো আজকে যাবো চাঁদে,
তথায় সাধের ঘর বানাবো আমোদে-আহ্লাদে।
দাও না মা-গো একটি রকেট,
পয়সা মেলাই ভর্তি-পকেট—
ভীষণ বেগে ছুটবে রকেট আকাশ-হাওয়ার দেশে ;
থাকবো আমি রকেটখানায় বৈমানিকের বেশে।

চাঁদের বুকে কাটবো মা-গো, সোণায় ভরা মাটি,—
অট্টালিকা রচবো তথায়, তাই তো পরিপাটি।
ফুলে-ফলে আলোর মেলায়—
পাখির ডাকে ভোরের বেলায়
সুয্যিমামার সঙ্গে কথা কইবো টেলিফোনে ;
রোদের হাসি মধুর বাঁশি চপল-হিয়ায়, মনে।

ষ্টীমার বেয়ে অচিন্‌পুরের সাগর দেবো পাড়ি—
পক্ষীরাজের ঘোড়ার পিঠে, চড়বো মোটরগাড়ী,
উড়বে ঘুড়ি হাওয়ার তালে—
তারার চোখে রাত্রিকালে
ভাসবে ধরায় জোছনামাখা আলোর তরীখানি,
মা-গো, আমায় বিদায় দিও, দাও হ'তে সন্ধানী ॥

———

ছোট্ট কুমার

অশোক পোদ্দার

ঘোড়ার পিঠে হাতীর পিঠে
উটের পিঠে চড়ে—
ছোট্ট কুমার চাঁদের দেশে
সকাল বিকাল ঘোরে।
ঘোড়ার পিঠে সোনার ঝালর
হাতীর মাথায় টুপী ;
কুকুর বেড়াল জান্‌লা খুলে,
দেখছে চুপি চুপি ॥

দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়ীটাই পছন্দ করলাম। চেঞ্জে গিয়ে যদি সহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদলানো কী? তোমরাই বলো!

বাড়ীটা বেশ বড়োই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পড়ো বাড়ী নাকি বলছিল কে। বিশ্বাস হয় না আমার। সহরের সুখ সুবিধা ছেড়ে এতদূরে মাঠের মধ্যিখানে, কে আর বাড়ী ভাড়া করতে আসবে বলো! সেইজন্যেই ভুতুড়ে বাড়ী বলে অখ্যাতি রটেছে, তাছাড়া কি? অন্তত আমার তো তাই মনে হোলো।

আমার বেশ পছন্দই হয়েছে বাড়ীটা। আমিও একা, বাড়ীটাও একাকী। সন্ধ্যার মুখে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে গেল।

দীর্ঘকালের ধুলো আর মাকড়সার জাল ভেদ ক'রে ঢুকলাম তো বাড়ীর ভেতর। ভুতের আস্তানার মতই হয়ে আছে বটে! ঘরদোরের কেউ কোনদিন খবর নেয় নি, এ বাড়ীর যে কখনো ভাড়াটে জুটবে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেবিল, চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আলমারি, খাট, তোশক, বিছানা, বালিশ—আসবাবের কোন কিছুরই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ সব। ভুতুড়ে বাড়ী বলে কেউ আসতে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়েও সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক নিজেই সব ঠিকঠাক ক'রে নেব। আজ তো নয় সেই কাল সকালে সে সমস্ত! এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে মুছে, বিছানা বালিশ পেতে, আজকের রাতের মতো ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারলেই হয়।

আপাততঃ তাই করা গেল। কিন্তু ঘরের মেঝেতে পড়ে রইল বহুদিনের জড়ো করা ধূলো। চারিধারের পুঁজি করা ধূলোবালি জঞ্জালের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। কিন্তু কী আর করা যাবে? এখন রাত্রের মুখে একা একা পরিষ্কার

করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আলো জ্বাললাম। উস্‌কে দিলাম ওর শিখাটা।

ইজিচেয়ারটায় বসলাম গিয়ে।

চারিধার নির্জন আর নিস্তব্ধ। আপনা থেকেই কেমন গা ছমছম করতে থাকে। মনে হলো আমি যেন কবরের ভেতর রয়েছি; যারা মরে গেছে তাদের শান্তিভঙ্গ করতে এসেছি এখানে।

মনটাকে অন্যদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করলাম। যেসব দিন চলে গেছে তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। কত পুরোনো দৃশ্য, আধভোলা মুখ, মধুর কণ্ঠস্বর, কত গান যা আগে লোকের খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু আজকাল কেউ গায় না আর। মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগলো।

ঘণ্টা দু'য়েক এইভাবে কাটালাম। নিঃসঙ্গতার বোধ ক্রমশঃই আচ্ছন্ন ক'রে এল। বাতি নিবিয়ে, আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। আমার মনে হতে লাগল কোনো বকরাক্ষস এ ঘরে ঘুমিয়ে আছে—এখুনি জেগে উঠে আমাকে বকে দেবে। কিম্বা কোনো তাড়কা রাক্ষুসী এক্ষুনি তাড়া করলো আমায়। কিম্বা কুম্ভকর্ণই কিনা কে জানে, যার ঘুম ভাঙলেই সর্বনাশ! এর মধ্যে কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, বাতাস সোঁ সোঁ করছে, আমি তাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম কখন।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সব নীরব নিস্তব্ধ, কেবল আমার আর্তহৃদয় বাদে; তার গুড়গুড় আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনছিলাম। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বল আস্তে আস্তে, কথা নেই বার্তা নেই, আমার পায়ের দিকে সরে যেতে শুরু করল, কেউ সেধার থেকে সেটাকে টানছে যেন। আমার নড়বার চড়বার এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এস্তক খালি হ'ল কম্বল সরতেই থাকলেন। কি আর করি, ভদ্রতা রাখা আর চলে না দেখে টানাটানি শুরু ক'রে দিলাম। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে কম্বলকে ধরে এনে আপাদমস্তক ঢেকে দিলাম আবার।

আমি কান পেতে প্রতীক্ষায় রইলাম। কী হয় দেখি। আবার কম্বল সরতে শুরু হোলো। এবার পা বরাবর গিয়ে পৌঁছুল। আবার তাকে পা থেকে টেনে আনলুম। এমনি ক'রে অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অদৃশ্য টাগ অব্ ওয়ার চলতে থাকল। যখন তৃতীয়বার কম্বল সরে গেল তখন টানবার শক্তি পর্যন্ত আমার রইলো

না। এবার কম্বলটা একেবারে উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অস্ফুটধ্বনি করলাম। পায়ের কাছ থেকে প্রতিধ্বনির মতো সেই সুরের প্রত্যুত্তর এল। আমার কপাল ঘেমে উঠল। মনে হোলো যা বেঁচে আছি, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে আমি মারা গেচি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতীর পায়ের মত একটা থপ থপ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল —মানুষের পায়ের শব্দ কখনোই এমন হতে পারে না, অবশ্যি অতি-মানুষের কথা বলা যায় না। থপথপে আওয়াজটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল শুনলাম, হুড়কো এবং দরজা না খুলেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মানসিক উত্তেজনা শান্ত হলে আমি আপন মনে বললাম। এ হচ্ছে স্বপ্ন— স্বপ্নই—স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়! ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন! ভাবতে চেষ্টা করছি যে, হয় এ বিভ্রম, নয় শুধু মায়া, তাছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোক যেমন ক'রে থাকে তেমনি একটু হাসতেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ীর মত দরজা জানলা জোরে জোরে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

এও কি তবে মতিভ্রম? চট ক'রে উঠে আলোটা জ্বাললাম। জ্বেলে দেখি, আবার ঘরের দরজা আগের মতই বন্ধ আছে, অকস্মাৎ খুলবার ও বন্ধ হবার কোনো অভিসন্ধি নেই তার। তখন আরামের নিশ্বাস ফেলে, সিগারেট ধরিয়ে আমার ডেক চেয়ারটায় এসে বসলাম।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আমার আপাদ-পিলে চমকে উঠল। চুরুট খসে পড়ল হাত থেকে। শ্বাস-প্রশ্বাসও ভারী সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার। একি, ঘরের পুঞ্জীভূত ধুলোর ওপরে আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি—! এ আবার কার পায়ের দাগ? এতো বড়ো দাগ যে, তার তুলনায় আমার পায়ের দাগ শিশুর বলে সন্দেহ হয়।

পূর্বে যে বন্ধুটি কম্বল ধরে টানাটানি ক'রে গেছে, এ কি তারই শ্রীচরণের চিহ্ন?

ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপনা থেকেই নিবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কানখাড়া ক'রে পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আসছে, কিন্তু ঘরের যে জানলাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্ত খাটো বলে কিছুতেই তা দিয়ে গলতে পারছে না। আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম—"বন্ধু, তোমার ওই গোদা পা নিয়ে এঘরে এস না, বেজায় স্থানাভাব।"

কিন্তু সে যে কর্ণপাত করেছে এমন মনে হ'ল না।

খানিক পরে পরে, একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একটু ইতস্ততঃ ক'রে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল যেন। আমার বিছানার চারপাশে ফুসফুস গুজগুজ শুনতে পেলাম, ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ, অদৃশ্য পাখার ঝটপট আর কি রকম একটা গুমরানো আওয়াজ। ভারী মুস্কিলেই পড়লাম আমি। কেননা আমার স্পষ্ট বোধ হোলো, ঘরে যেন কারা এসেছে, আমি আর একলা নই।

ঈষৎ উজ্জ্বল কি যেন একটা বালিশে পড়ল। তার দু'ফোঁটা পড়ল আমার মুখে, পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে মুখময় ছড়িয়ে গেল। তারপরেই দেখতে পেলাম—আবছা আবছা মুখ, সাদা সাদা হাত যেন বাতাসে ভাসচে। এই ভেসে উঠচে এই মিলিয়ে যাচ্ছে! বুঝলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু: অবশ্যি মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশী বাঞ্ছনীয়! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আস্তে আস্তে যেমন উঠতে গেছি কার চ্যাপ্টা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল। এই অনাকাঙ্খিত মিলনের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ধড়াস ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আবার। তার খানিক বাদে বোধ হলো একটা কাপড়-গোপড়ের খস খস শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ফের সব চুপচাপ। কতকালের রোগীর মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। কম্পিত হাতে বাতি জ্বাললাম। আলো জ্বেলে, ধূলোর পরে যেসব ভয়ানক পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা করছি, হঠাৎ বাতি যেন নিবুনিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্তে আবার হাতীর পায়ের শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা করবার অজুহাতেই থেমকে থেমে গেল। বাতিটা নিবুনিবু হয়ে এসে কেমন নীল আলো বিকীরণ ক'রে, কিনা জানি না, সারা ঘরটা ছায়াপথের আলোয় ভরিয়ে দিলো।

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝটকা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার গালে এসে লাগল। আমার সামনে বাষ্পময় কি একটা খাড়া হয়ে রইল। দারুণ অস্বস্তি আর অসুবিধা আমি বোধ করি! কিন্তু কী যে করব—!

প্রথমে একটা হাত তারপরে দু'টো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, যার এক বিষণ্ণ বদন ক্রমশঃ সেই বাষ্পাকার থেকে আত্মপ্রকাশ করল। দেখলাম আমার সামনে প্রায় নগ্নকায় প্রকাণ্ড দৈত্যের মত এক চেহারা সটান দাঁড়িয়ে রয়েচে। লোকটার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার ভয় দূর হোলো, মনে হোলো এ কোনো ক্ষতি করবে না—

ক্ষতিজনক ভূত বোধকরি নয়? আমার স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভুতটাকে কাছে পাওয়া গেল—এ একরকম ভালোই! খুশিই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় আত্মীয়স্বজন পাওয়ার মতোই অনেকটা আর কি!

আমি তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্লাম—"কে হে তুমি? তুমি কি জানো আমি দু' তিন ঘণ্টা যাবৎ মুমূর্ষু হয়ে রয়েছি? যাক, তোমাকে দেখে খুশি হওয়া গেল। আমার যদি একটা চেয়ার থাকতো, অবশ্য তোমাকে ধারণ করবার মতো—আহা, থামো থামো, ঐ জিনিসটার ওপর বসে পোড়ো না যেন!"

কিন্তু কাকেই বা বলা! ততক্ষণে মেহগ্‌নির অমন দামী চেয়ারটাতে সে বসে

সেই পাথুরে চেহারা দেখতেই আমি বেরিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে হয়েছে, তাই খুঁজে পাচ্ছি না!"

"ভাবনার কথাই বটে!" আমি বলি, "নিজের চেহারা নিজে না দেখতে পাওয়ার মতো দুঃখ আর কী আছে! তা এক কাজ কর না কেন? এত না হেঁটে, রেলে যাতায়াত করলে তো পারো। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে!"

"হেঁটেই মেরে দেব। রেল কেন আবার?" সে আশঙ্কা প্রকাশ করে, "রেলে টিকিট লাগে, তাছাড়া ভারী মারা পড়ে মানুষ, কলিশন হয় কি না সেই ভয়ে রেলে চাপি না।"

"তা, চাপো না, ভালোই কর!" ওর কথায় আমি সায় দিই। "ওতে খরচাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদ্দিন তুমি এইরকম ঘুরছ পৃথিবীতে?"

"পৃথিবীতে? তা প্রায় একশো বছর হবে!" সে জবাব দেয়—"পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও।"

"পৃথিবী ছাড়িয়ে—কি রকম?" আমি অবাক হই, "অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার?"

"আহাহা! তাকি আমি বলেছি? আর, সেসব জায়গায় যাবোই বা কেন? কোন দুঃখে যাবো? তারা কি আমার স্ট্যাচু খাড়া করেচে?"

"তবে পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম?"

"যোগ বলে। আকাশ পথেও চলাফেরা করতে পারি কিনা আমরা। অনেক সময়ে মাটির থেকে, দু'হাত, আড়াই হাত, পৌনে চার হাত পর্যন্ত উপরে উঠে যাই!

"বলো কি?"

"ওই রকম!" সে ব্যক্ত করে—"যোগের ক্ষমতাই এই। মরলে মানুষ মাত্রেই এই যোগ বল লাভ করে। প্রাণবিয়োগ বলেই এটা লাভ করা যায়—অনায়াসেই! আশ্রমে-টাশ্রমে গিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকতে পারলে জীবনেও অনেক সময় পাওয়া যায়।"

"ওঃ, এখন বুঝছি—" হঠাৎ আমার টনক নড়ে; "তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় হুবহুব।"

"কি—কি?" কৌতূহলী হয়ে ওঠে সে।

"কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড়ো বড়ো পায়ের দাগ দেখতে

পাওয়া গেছল—যা নিয়ে খবরের কাগজে খুব হৈ-চৈ পড়েছিল সেই সময়ে—এখন বুঝতে পারছি সে সব কার কীর্তি।"

"কার?"

"কার আবার? তোমার।"

"তা হবে।" বিষণ্ণভাবে সে ঘাড় নাড়ে—"খবরের কাগজও দেখি নি বহুৎ দিন।"

"দেখাতাম তোমায়, রাখি নি তো। তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জানত কে! তাহলে রাখতাম।" আমি বলি—"কিন্তু বলো, আমার বাড়ীতেই পায়ের ধূলো দিলে কেন হঠাৎ?"

তোমার আস্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা। এই বাড়ীটায় আলো জ্বলছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখলাম—তার সঙ্গে আমার নামের ভারী মিল। ভাবলুম, আমারই জ্ঞাতিগুষ্ঠি হয়ত কেউ, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে নিই না কেন আমার স্ট্যাচুর ঠিকানাটা। যাক্, তুমি যখন জানোই না, তখন আর বৃথা বসে থেকে কী লাভ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার।"

"তোমার নামটি কি তা তো আমায় বলে গেলে না?"

"আমার নাম? আউটরাম।" সে বলে—"জাঁদরেল আউটরাম! বেঁচে থাকতে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ। তখন জেনারেল বলে আমায় ডাকত সবাই। এরকম অদ্ভুত নাম শুনেছ এর আগে? অবশ্যি তোমার নিজের নাম ছাড়া। আচ্ছা, আমি তবে এবার।"

আমার বাক্‌স্ফূর্তি হবার আগেই আউটরাম আউট হয়ে গেলেন। আমার লাল কম্বলটা সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না।

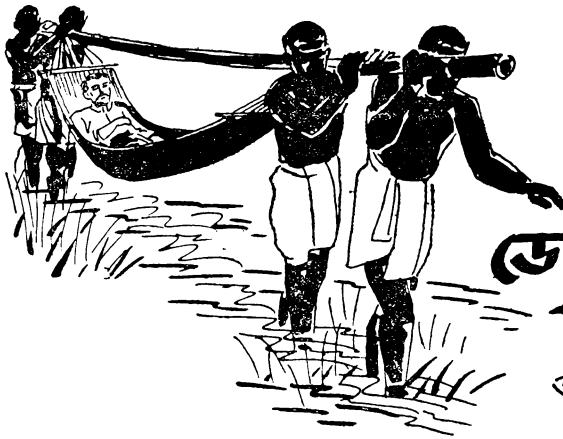

ডেভিড লিভিংস্টোন

অমলকুমার মিত্র

এক'শ বছর আগেও আফ্রিকা সম্বন্ধে লোকে এত কম জানত যে "অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ" বা "ডার্ক কন্টিনেন্ট" নামেই আফ্রিকা সবার কাছে পরিচিত ছিল। তারপরে বিশ্ববিখ্যাত পর্য্যটক ডাঃ ডেভিড লিভিংষ্টোনের অক্লান্ত চেষ্টায় আফ্রিকা আজ সভ্য মানুষের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসেছে।

১৮১৩ সালে লিভিংষ্টোনের জন্ম হয় স্কটল্যাণ্ডে। ডাক্তারী পাস করার পর সাতাশ বছর বয়সে তিনি আফ্রিকায় চলে যান। আফ্রিকার কালো নিগ্রোদের খুব ভালবাসতেন দরদী এই মানুষটি। তাঁর ভালবাসার স্পর্শে নিগ্রোদের প্রাণকে জয় ক'রে নেন লিভিংষ্টোন। তারাও আস্তে আস্তে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে।

তিরিশটি বছর আফ্রিকায় থেকে কাফ্রীদের আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব কিছু শিখে নেন লিভিংষ্টোন। শেষে এমনই হয় যে তাঁকে ছাড়া কাফ্রীদের চলতই না।

আর একজন সহকর্মী ডাক্তারের সাথে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে কিছুদিন বাস করেন লিভিংষ্টোন। সেখানে তিনি অসুস্থ কাফ্রীদের ওষুধ দিতেন, সেবায় ও যত্নে তাদের সুস্থ ক'রে তুলতেন।

তারপর একদিন তিনি স্থির করলেন—আফ্রিকার যে অঞ্চলে কোনদিন কোন সাদা মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি—সেই মধ্য আফ্রিকার গভীর গহনে তিনি প্রবেশ করবেন, গিয়ে দেখবেন এক অজানা জগৎকে। বেচুয়ানাল্যাণ্ডের বন্ধু কাফ্রীরা

লিভিংষ্টোনকে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে অনুরোধ করলেন। বল্লেন—"সাহেব, আফ্রিকার ভেতর যাবেন না। বড় ভয়ঙ্কর সে দেশ। বিরাট বিরাট নদীতে বড় বড় কুমীররা ঘুমিয়ে থাকে, আর নরখাদক হিংস্র লোকেরা সেখানে বাস করে।"

ডাঃ ডেভিড লিভিংষ্টোন তো দমলেনই না, এবং তাদের কথায় তাঁর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। অজানাকেই যদি জানতে না পারলাম, অদেখাকেই যদি দেখতে না পারলাম—তাহলে ধিক এই মনুষ্য জীবনকে।

আরও দু'জন ইংরেজকে নিয়ে ১৮৪৯ সালে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। মরুভূমির ওপর দিয়ে সাতশ মাইল অতিক্রম ক'রে সবশেষে তাঁরা গামী হ্রদের ধারে এসে পৌঁছলেন। এর আগে আর কোন ইংরেজ গামী হ্রদ দেখেন নি—এঁরাই প্রথম দেখলেন। জায়গাটা ছিল দারুণ অস্বাস্থ্যকর: মশা, মাছির প্রচণ্ড উপদ্রবে তিষ্টান দায়, লিভিংষ্টোন তাই স্থির করলেন--'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' আরও ভাল জায়গার সন্ধান করতে হবে। গামী হ্রদের উত্তর দিক ধরে বেশ কয়েক শত মাইল এগিয়ে গেলেন তিনি। এসে পেলেন মস্ত বড় এক নদী—মানচিত্রে জামবেসি নদী নামে যে নদী খ্যাত। একেবারে আফ্রিকার গহন গভীরে এ নদী—সভ্যতার একদম বাইরে। এখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জলপ্রপাত ভিক্টোরিয়া। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে লিভিংষ্টোন এই জলপ্রপাতটির নাম রাখলেন "ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।" ওখানকার কাফ্রীরা জলপ্রপাতটিকে "ধোঁয়া গর্জন" জলপ্রপাত নামে অভিহিত করতেন। কারণ ভয়ানক গর্জন ক'রে জল নেমে আসে অনেক ওপর থেকে আর সমস্ত উপত্যকাটা ভরে যায় ছোট ছোট জলকণায়—দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

লিভিংষ্টোন ভাবলেন, ভ্রমণকারীদের পক্ষে এ সব চওড়া নদীগুলি কতই না কাজের হবে! তিনি স্থির করলেন—এ ধরনের আরো কয়েকটি নদীর সন্ধান বের করতে হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এসব নদী খুব কাজে লাগবে। অচিরেই কাফ্রীরা ওঁর নাম দিয়ে দিল "নদী-সন্ধানী" কারণ কেবলই নদীর সন্ধানে তাঁকে ঘুরতে দেখা যেত।

যখন ভ্রমণে বের হতেন—যদ্দুর সম্ভব কম মালপত্তর নিতেন লিভিংষ্টোন। প্রায়ই কাফ্রী কুলিদের সাথে পদব্রজে তাঁকে পথ অতিক্রম করতে হত; মাঝে মাঝে একটা ষাঁড়ের পিঠে চেপেও তাঁকে ঘুরতে দেখা যেত। ষাঁড়টার নাম রেখেছিলেন

"সিন্ধবাদী।" সিন্ধবাদটাকে একটুও ভালবাসতেন না লিভিংষ্টোন। বড্ড বদ মেজাজী ছিল ষাঁড়টা। তার ওপর ওর পিঠে চড়েও আরাম ছিল না মোটে।

প্রায় বিশটি বছর ধরে আফ্রিকাকে চষে বেড়ালেন লিভিংস্টোন। এই বিশটি বছরে একবারের তরেও আফ্রিকা থেকে বের হলেন না তিনি। কিন্তু এত পরিশ্রম ও বয়সের গুরুভারে ডাক্তার লিভিংস্টোনের স্বাস্থ্য আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করল। আর আগের মতন পরিশ্রম করার ক্ষমতা রইল না তাঁর। প্রায়ঃসই জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে শুরু করলেন তিনি। অগত্যা কি আর করা—স্বদেশে ফিরে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন লিভিংস্টোন। ১৮৫৬ সালে আবার ফিরে আসলেন তিনি দেশে। লিভিংস্টোনের নাম তখন সবার মুখে মুখে, ঘরে ঘরে। সবাই তাঁকে দেখবার জন্যে পাগল। অজানা আফ্রিকাকে যিনি আপন ক'রে নিতে পেরেছেন—সেই দুঃসাহসী মানুষটি যে সবার আপনজন। তাই প্রত্যহ ওঁর দর্শনের অভিলাষে ওঁর বাড়ীর সামনে মস্ত বড় ভিড় জমে উঠত।

লিভিংস্টোনই প্রথম সভ্য মানুষের সামনে আফ্রিকাকে তুলে ধরলেন। তিনি সে দেশের বিরাট বিরাট পাহাড়, গভীর বুনো অরণ্য, মস্ত সব নদী আর গভীর সব হ্রদের কথা গল্প করতেন। আর গল্প করতেন ওদেশের ভয়ঙ্কর ক্রীতদাস প্রথার কথা।

মানুষ নিয়ে বেচা কেনা করত আরব মহাজনেরা। ওরা কাফ্রী সর্দারদের বন্দুক আর বারুদ যোগাত। সর্দাররা সে সব অস্ত্র নিয়ে শত্রুপক্ষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত, তারপর বিপক্ষদলের কাফ্রীদের ধরে ধরে আরবদের হাতে তুলে দিত। আরব মহাজনরা হতভাগা এসব কাফ্রীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাত, তারপরে আমেরিকায় নিয়ে চড়া দামে কার্পাস ক্ষেতের মালিকদের কাছে ওদের বেচে দিত।

ক্রীতদাস প্রথা ছিল লিভিংস্টোনের দু' চোখের বিষ। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে ইংরেজ সরকারকে চাপ দিতে লাগলেন। বল্লেন—মানুষ বেচা-কেনার বর্বর প্রথা যেভাবে হোক বন্ধ করা চাই। লিভিংস্টোনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে আফ্রিকার বুকে বসে আরব মহাজনদের এ বিশ্রী ব্যবসা চিরতরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

ইংল্যাণ্ডে বেশীদিন রইলেন না লিভিংস্টেন। তাঁর প্রিয় আফ্রিকা এবং আফ্রিকার 'কেলে মাণিক' কাফ্রীদের কাছে তিনি আবার ফিরে গেলেন কিছুদিন পরে। এবার তিনি গেলেন নায়াসাল্যাণ্ডে এবং বছর চারেক ধরে ওঁর কোন খবরই পাওয়া গেল না। নায়াসা হ্রদের তীরে পৌঁছলেন লিভিংস্টোন—কিন্তু এমন কাউকে সেখানে তিনি পেলেন না, যিনি নিয়ে যেতে পারেন লিভিংস্টোনকে হ্রদের ওপারে। আরবরা ওঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল—সাদা এই মানুষটির মাথায় 'বদ মৎলব' আছে। ক্রীতদাস প্রথাকে দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর। ফলে লিভিংস্টোনকে হ্রদের দক্ষিণ দিক ধরে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর রইল না এবং তারপর উত্তর দিক ঘুরে টাঙ্গানাইকা হ্রদে এসে পৌঁছতে হ'ল তাঁকে।

প্রায়ই জ্বরে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে গিয়েছিলেন লিভিংস্টোন, এ ছাড়া অন্যান্য অনেক সমস্যাও তাঁর ছিল। একবার ওঁর কুলিরা চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে লিভিংস্টোনের প্রচুর রসদ ও মহামূল্যবান সব ওষুধ চুরি ক'রে চম্পট দেয়। শেষের এই ক্ষতিটাই বড় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্বেও প্রচণ্ড মনের জোরে ভর ক'রে মাত্র তিনটি কুলির সাহায্যে আরও দু'টি বছর তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু তারপরে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন ডাঃ লিভিংস্টোন। অনেক আশা নিয়ে উজিজি নামক এক স্থানে আসেন তিনি। ভাবেন—উজিজিতে রসদ ও ওষুধ পেয়ে যাবেন। কিন্তু এসে দেখেন "আশা সবই মিছে ছলনা" কোন ওষুধ, কোন রসদই পৌঁছয় নি উজিজিতে। তখন বাঁচার সব আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

হঠাৎ একদিন ভোরে ওঁর চাকর সুসি ছুটে এল। চীৎকার ক'রে বল্ল—"একজন সাহেব, একজন সাহেব এসেছেন।"

সাহেবটি একজন আমেরিকান—হেনরি মর্টন স্ট্যানলি তাঁর নাম। বিশ্ব-বিখ্যাত পর্যটক লিভিংস্টোনকে খুঁজে বের করবার জন্য তিনি চলে আসেন আফ্রিকার গভীরে। মর্টনকে কাছে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন লিভিংস্টোন, কারণ মর্টনের সাথে ছিল রসদ ও ওষুধ। আমেরিকানটি লিভিংস্টোনের সাথে মাস চারেক রইলেন এবং দু'জনে মিলে একত্রে টাঙ্গানাইকা হ্রদের অনুসন্ধান কার্য চালালেন।

তারপর একদিন হেন্‌রি মর্টন স্ট্যানলির বিদায় নেওয়ার সময় এল। লিভিংস্টোনকে তিনি বারবার অনুরোধ করলেন—"আমার সাথে চলে আসুন।"

কিছুতেই গেলেন না লিভিংস্টোন। বল্লেন—যে কাজ শুরু করেছি, সে কাজ শেষ না ক'রে কি ক'রে যাই, ভাই? কিন্তু তখনও তিনি খুব অসুস্থ এবং এর কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। একদিন সকালে ওঁর বিশ্বস্ত দুই ভৃত্য—সুসি ও চুমা—ডাঃ লিভিংস্টোনের তাঁবুতে প্রবেশ ক'রে দেখেন—লিভিংস্টোন শয্যার পার্শ্বে মৃত অবস্থায় হাঁটু গেড়ে রয়েছেন।

এবং তারপর সুসি ও চুমা যা করল তা ভারি আশ্চর্য। এই দু'টি সরল হৃদয় কাফ্রী ভাবল—তাদের সাহেবকে তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই কবর দিতে হবে, এখানে ফেলে রাখাটা ঠিক হবে না। ডাঃ লিভিংস্টোনের মৃত দেহটাকে নিয়ে দেড়শ' মাইল দূরবর্তী সাগরতীরে ওরা এল। সেখান থেকে জাহাজে ক'রে শবদেহটাকে আনা হ'ল ইংল্যাণ্ডে, তারপর লণ্ডনের জগৎ খ্যাত ওয়েস্ট মিনিষ্টার গির্জায় বিশ্বের সেরা সেরা মনীষীদের পাশে—ডাঃ ডেভিড লিভিংস্টোনকে চিরতরে সমাহিত করা হ'ল।

কে! (চিত্র কাহিনী) পূর্বানুবৃত্তি

কে!
দেখতে হবে ওটা কি জীব?
সিন্ধে ছুটে আসে সেখানে
কিন্তু হঠাৎ সিন্ধেকে আশ্চর্য করে সেই ভয়ঙ্কর নিমেষে সর্দারকে কাঁধে তুলে
বাঁচাও!
আরে ওটা জীবন্ত!
বিদ্যুৎবেগে বনের মাঝে অদৃশ্য হল।
বাঁচাও!
আশ্চর্য ধূর্ত তো! ক্যামোফ্লেজ-করে পড়ে-ছিলো?
দুঃসাহসী সিন্ধে ছুটে গিয়ে ঢুকলো বনের মাঝে।
নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে!

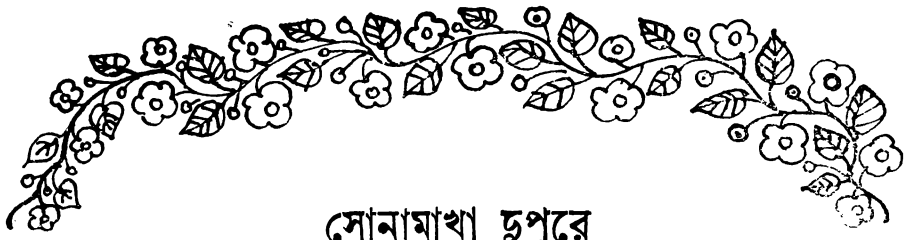

সোনামাখা দুপুরে

ধূর্জ্জটী প্রসাদ দত্ত

আকাশটা নীল নীল মাঝে মাঝে মেঘ
সাদা সাদা রঙ করা উড়ে উড়ে যায়,
বটের ছায়ায় এক ক্ষ্যাপাটে বাউল
কি যেন উদাস সুরে নাচে আর গায়।

দূরের গাঁয়ের একপাল কালো ছেলে
নেমেছে নদীর জলে নাইতে এখন,
শুকো জাল নিয়ে ফেরে মাছ ধরা জেলে
ঝাপসা দু-চোখে দেখা ছায়ার মতন।

ভরা রোদে ভিজে ভিজে দু'টো পাতিকাক
বসেছে বোসের বাড়ী আমগাছে ওই,
গরুর গলায় বুঝি বেজে ওঠে শাঁখ
ঘুঘু ডাকে, 'আয় ঘুম, খোকা গেল কই'।

আমি চেয়ে চেয়ে ভাবি—আকাশ কী নীল,
কে জানে শঙ্খমালা বন্দী কোথায়?
সোনাঝরা বালুচরে মেঘের মিছিল
ছায়ার পালক ফেলে ভেসে চলে যায়।

বাহাদুর ছেলে

প্রীতিভুষণ চাকী

দুই বন্ধুতে খুব ভাব।

একজনের নাম ছোটু আর একজনের নাম বেচু। বেচু খুব কথায় পটু। ছোটু চুপচাপ থাকে; তাছাড়া ওর একটা পা নেই। জোড়া লাগানো কাঠের পায়ে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে হাঁটে। পা না থাকলে কি হবে, খুব কাজের ছেলে ছোটু। বাবার রোজগার ভাল নয়। বাবাকে সাহায্য করবার জন্যে ওর ভারী চিন্তা। কোন্ এক কারিগরের সাথে ভাব ক'রে কাগজের ফুল বানানো শিখে নিয়েছে। ইস্কুলের পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ও কাগজের ফুল বানায়, রং-বেরং এর ফুল। তারপর দোকানে দোকানে দিয়ে আসে, এর জন্যে পয়সা পায়।

বেচু মাঝে মাঝেই ওর ঘাড় ভাঙে। ওর পয়সাতেই খাবার খায়। বড় বড় কথা বলে, রাজা-উজির মারে। নিজের সব বীরত্বের কথা বলে। একদিন বললো বেচু: 'জানিস, আমার দৌড়ে কত দম? ছোটবেলায় আমি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কত প্রাইজ পেয়েছি। তাছাড়া জানিস তো? দু'হাত ছেড়ে সাইকেল চালাতে আমার জুড়ি নেই। এ ছাড়াও জানিস তো? আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়েছিলাম, তবু আমার কিছু হয় নি।'

ছোটু মুখ বুঁজে এসব কাহিনী শুনতে শুনতে যাচ্ছিল রাস্তার এক পাশ দিয়ে। হঠাৎ পালাও, পালাও শব্দে চমকে উঠলো ছোটু। দেখলো একটা পাগলা ষাঁড় মরীয়া হয়ে ছুটছে এদিক ওদিক, আর কী ভীষণ ফুঁসছে ষাঁড়টা। পথচারীরাও যে

যেদিক পারছে ছুটছে। কিন্তু এ কী? ছোট্ট একটা মেয়ের দিকে ষাঁড়টা এগিয়ে আসছে যে!

ছোটু কিছুতেই স্থির থাকতে পারলো না। কমজুরি পা নিয়েই সে ছুটলো মেয়েটার দিকে। তারপর চিলের মতো ছোঁ দিয়ে কোলে ক'রে নিয়ে এলো মেয়েটাকে ফুটপাথের ওপরে। ষাঁড়টা তখন অন্যদিকে চলে গিয়েছে। ছোটু হাঁপাতে লাগলো, পায়ে একটু চোট খেলেও সামলে নিয়েছে সে। যাক্ মেয়েটা তো রক্ষে পেয়েছে। ছোটুর চোখে মুখে তৃপ্তির একটা আভা ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বেচু কোথায় গেলো? বেচু? এদিক ওদিক তাকাতেই সে দেখে, বেচু একটা পার্কের রেলিং থেকে নেমে আসছে।

বেচু বলে উঠলো: 'বাপ্‌রে, খুব বাঁচা বেঁচেছি; ভাগ্যিস রেলিংটার ওপরে গিয়ে উঠেছিলাম!

এইবার শুধু ছোটুর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে এলো—সত্যিই তুই বাহাদুর ছেলে!

———

সবুজ সবুজ ঘাসের বনে

সুনির্মল চক্রবর্তী

সবুজ সবুজ ঘাসের বনে
ফড়িং খেলে আপন মনে।
কেউ বকে না, কেউ মারে না,
ধরতে তাকে কেউ পারে না।

কচি কচি পাতার পরে
বসে আবার চুপটি ক'রে।
খানিকটা কি ভেবে শেষে
বাতাসে ও যায় যে ভেসে।

বেড়ায় শুধু উড়ে উড়ে,
দেখে সবই ঘুরে ঘুরে।
কেউ তো ওকে বলে নাকো
পড়া-লেখা করতে থাকো।
কী যে কথা ফুলের কানে
বলে রোজই, সেই তা জানে।

———

স্বাধীনতার একটি প্রদীপ

হাসিরাশি দেবী

দিল্লী-ষড়যন্ত্রের কথা জানা যেতেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছিল ভারতের শাসক-গোষ্ঠী। বুঝেছিল এর আগের আরও কয়েকটা ঘটনা থেকেই, যে ভারতে ওদের রাজসিংহাসনের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠেছে।

তাই ওরা প্রচার করতে লাগল—এ দেশের যে কোনও মানুষ, তা-সে হিন্দুই হোক কিম্বা মুসলমানই হোক, কাউকেই বিশ্বাস করা উচিত নয়; কিন্তু তাহলেও, যে তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে সহায়তা করবে,—তাকে বিনা কৈফিয়তে দেওয়া হবে অনেক, অনেক টাকা পুরস্কার, আর সরকারী আনুগত্য স্বীকারের আভিজাত্যপূর্ণ খেতাব।

এছাড়াও সেইসব অনুগত প্রজার জন্য সরকার সব সময়ে রাখবেন সতর্ক আর সশস্ত্র প্রহরী-ব্যবস্থা।

কিন্তু এত খবরাখবর নেওয়া সত্বেও তাঁরা জানতে পারলেন না, যে বিপ্লবীরা তাঁদের আশে-পাশেই ঘুরছে সর্বদা। তাঁরা ঠিক ক'রেছেন তরুণ-ভারতের এই

মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের সমস্ত মেহনতী মানুষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে।

এই মেহনতী মানুষও থাকবে চারটি স্তরের। যেমন—যাঁরা কল-কারখানায় কাজ করেন, অর্থাৎ মজুর। যাঁরা জমি চাষ ক'রে ফসল ফলান দিনের রোদ আর রাতের অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে, বৃষ্টিতে ভিজেও, অর্থাৎ কৃষক। যাঁরা লেখাপড়া নিয়ে থাকেন, সেই ছাত্রদল; আর, যাঁরা দেশ রক্ষার জন্য কোম্পানীর সৈনিক বিভাগে চাকরী করেন, এই মনোভাব সংক্রামিত করতে হবে তাঁদের মধ্যেও।

তবে তো সমবেৎ চেষ্টার ফলাফল ঘটবে। স্বাধীনতা লাভ করবে পরাধীন ভারতবর্ষ।

দেশের অনমনীয় ব্রিটিশ-রাজশক্তি তখনও নিজেদের খেয়াল আর খুশী মাফিক আইনের-রশি তৈরি ক'রে পরিয়ে দিচ্ছে ভারতবাসীর গলায়। নিজেদের সুখ-সুবিধার পথ উন্মুক্ত রেখে পদদলিত করছে ভারতবাসীকে। প্রচার করছে ভারতের সংস্কৃতি আর আদর্শকে ঘৃণ্যরূপে।

যা ভারতবাসীর পক্ষে অসহ্য!

তাই, চাই এর প্রতিবাদ করতে! চাই পরাধীনতা থেকে মুক্তি। চাই মানুষের মত মাথা তুলে বাঁচবার অধিকার।···

গুপ্ত সমিতি তৈরি হ'ল। এক একজন ভারতের এক এক দিকের জনমত গঠনের ভার গ্রহণ করলেন, দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যে দিয়ে। এগিয়ে চললেন তাঁরা দুঃখের দুর্দ্দিন আর বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে।···

কাশীর একটা অখ্যাত গলিপথ।

সেদিনকার বেলা শেষ হয়ে এসেছে; চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে রাতের অন্ধকার, আর তারই খানিক খানিক এসে যেন জমাট বেঁধেছে এইসব নিচের দিকে।

একজন পথিক আসছিল একদিক থেকে; কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই পথ হাঁটছিল সে। হঠাৎ পথের বাঁক ঘুরেই চমকে উঠল ও।

ভিন্ন দিক থেকে এই দিকে এগিয়ে আসছে আরও দু'জন পথিক।

পথের মোড়ের গ্যাসের আলো ওদের ওপর ছড়িয়ে পড়তেই প্রথম মানুষটি সচকিত হ'য়ে ওঠেন।

—আরে! শচীন যে

সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গের লোকটির দিকে নজর পড়তেই চুপ ক'রে যায়। সম্ভবতঃ এ তাঁর সতর্কতা।

শচীন্দ্রের সঙ্গীটির দীর্ঘদেহ পাঠান দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদে ঢাকা থাকলেও মনে হচ্ছিল ওর সারা মুখে ফুটে উঠেছে আত্ম-বিশ্বাসের দীপ্তি আর কর্ম-প্রেরণা।

আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে শচীন্দ্র সান্যালের মুখ। বলেন—তোমার কথাই ভাবছিলাম কয়দিন ধরে।

—বটে!

হাসেন নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

এঁরা সকলেই গুপ্ত সমিতির সভ্য।

পাশের মানুষটিকে দেখিয়ে শচীন্দ্র বলেন—এঁকে নিশ্চয় চেন না? ইনি মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লব সমিতির একজন বিশিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু এখন চলেছ কোথায়?

—কোথায় আর? রাসবিহারী দাদার আস্তানায়।

—কিন্তু তিনি একটু বিশেষ কাজে বাসার বাইরে গেছেন, আমরা আসছি ঐখান থেকেই। যাই হোক, তোমার যখন দেখা পাওয়া গেছে, তখন দু' একটা খবর জানানো দরকার। এখানে হবে না। চল, ঐ সামনের ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে বসি। ওদিকে বড় একটা কেউ যায় না।

অন্ধকার-মাঠের মধ্যে তিনজন পাশাপাশি বসে।

খুব নিচু স্বরে ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলে:

—আমাদের চেষ্টা সার্থকতার পথে, বুঝলে নলিনি? আমরা এখন সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরী! জার্মান সরকারের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। সারা উত্তর ভারতের ছাত্র-সমাজ তৈরী আমাদের সঙ্গে হাত মিলাতে; জার্মান আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধও আসন্ন। আমাদের বৈপ্লবিক উত্থান সেই সুযোগে, কারণ বেশীর ভাগ ফৌজকেই ইংরেজ সরকার যুদ্ধে পাঠাচ্ছে। বাদ-বাকিদের সঙ্গে না করায় সেখানে জমে উঠেছে অসন্তুষ্টি। তারই মধ্যে

আগুন ধরিয়ে রেখেছেন রাসবিহারী বসু। অপেক্ষা কেবল জ্বলে ওঠার। কিন্তু সেদিনও ঠিক হ'য়ে গেছে।

—কবে? কোথা থেকে?

উনিশ-শো পনের খৃষ্টাব্দের চব্বিশে ফেব্রুয়ারী। প্রথম বিদ্রোহ পরিচালনা হবে লাহোর-ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে; পরিচালক নিজে রাসবিহারী বসু, আর আমার এই সহযাত্রী শ্রীযুক্ত পিঙ্গলে।

কিন্তু এই শসস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থানের ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে যে বাধা এগিয়ে এল, এ তারই বর্ণনা।

কোনও রকমে জরুরী প্রয়োজনের পাশ নিয়ে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট-এর কম্যাণ্ড্যাট এর শিবিরে খুব সাবধানে আর সতর্কতার সঙ্গে প্রবেশ করে সৈন্য ব্যারাকের এক সাধারণ জমাদার।

হুজুর! জরুরী খবর আছে, জরুরী খবর; যা কেবল আমিই দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে কি পাব?

শিকারের গন্ধ পাওয়া বাঘের মত জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে কম্যাণ্ড্যাণ্ট সাহেবের দুই চোখ। বলেন—যদি খবর খাঁটি হয়, তাহ'লে পাবে টাকা, অনেক টাকা—ভাল খেতাব। তাছাড়া যা চাও তাই। কিন্তু খবরটা কিসের?

ফৌজদের বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার।

প্রমাণ?

হাতে হাতে দেব হুজুর, না পারলে আমার জান কবুল। তবে একটা কথা, দূর থেকে দেখিয়েই কিন্তু পালাব, না হলে ওদের হাতেই মারা পড়বো আমি!

বিপ্লব-পরিচালনার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে। লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট-এর সৈন্যদের ব্যারাকে বেজে চলেছে বিপজ্জনক ঘোষণার ঘণ্টাধ্বনি—ঢং! ঢং!...

দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। বোমা হাতে নিয়েই ব্যারাকে ধরা পড়েছেন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির বিশিষ্টকর্মী শ্রীপিঙ্গলে। কিন্তু আর একজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই, তার নাম শ্রীরাসবিহারী বসু।

ব্যারাক থেকে অদৃশ্য হবার আগে কয়েকবার মাত্র তাঁকে টোটা ভরা পিস্তল হাতে উল্কার মত ছুটে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল সেই বিশ্বাসঘাতক জমাদারের সন্ধানে।

কিন্তু খুঁজে পান নি তাঁকে। সরকারের দলও খুঁজে পায় নি আর রাসবিহারীকে।

হয়তো তিনি হাওয়ার মতই অদৃশ্য হয়েছেন। এরপর ?

এরপর রাজদ্রোহের অপরাধের শাস্তি হিসাবে ভারতের আর একজন মুক্তিকামী সন্তানের জীবনদীপও নিবে গেল—ফাঁসীর দড়িতে গলা জড়িয়ে।

এই ভারত-সন্তানের নাম—শ্রীপিঙ্গলে।

———

ছোট্ট পাখি

কার্তিক ঘোষ

ছোট্ট পাখি
এত্তোটুকুন
ঠোঁট টুকটুক লাল···
কোথায় গেল
দুলিয়ে দিয়ে
তিনটে গোলাপ ডাল।

ছোট্ট পাখি
এত্তোটুকুন
রং বাহারি ডানা···
শিস্ দিয়েছে
টুইচ্ টুইচ্
নাচছে তা-তিন তা-না!

এই টুকুনি পাখি···
মিঠুর দোলায় দুলছে এসে
ঘুম ধরেছে না কি ?

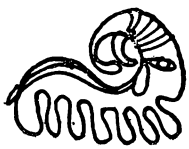

কোথায় আলোর দিশা

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বুদ্ধের দেশ এটা—গান্ধীজীর দেশ—
এই দেশে আছে রবি বিবেকের রেশ।

সুভাষ, শিবাজী শত বীর এই দেশে
নির্ভিক ক্ষুদিরাম এসেছেন হেসে।

তবে কেন আজ মোরা আদর্শহীন
হয়ে ঘুরি, আড্ডায় মাতি রাত-দিন!

আমাদের কেন এত অশালীন বেশ
স্বার্থ ও সংঘাতে হই নিঃশেষ।

উন্নতি নাই দেখি শুধু অবনতি
ছেলেমেয়ে মেলা ভার সুকুমারমতি।

ছিনতাই, গুন্‌ডামী : ঘৃণা-লজ্জায়
'মানুষ-পশু'র কথা হায়—বলে যায়!

কোথায় আলোর দিশা মানবতা রথ?
কে দেখাবে আগামীর আশা আলো পথ??

ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল ভ্যান ওয়েডেন। তাকে ঘিরে রয়েছে অনেক অপরিচিভ লোক। চোখে মুখে আবার জলের ঝাপ্টা এসে পড়ে। ক্রমে ক্রমে মনে পড়ে সানফ্রানসিসকো উপসাগরে তাদের জাহাজ ডুবি হয়। ভেসে পড়ে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সমুদ্রে। আর মনে নেই।

ওয়েডেন উঠে বসতেই ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এ জাহাজটার নাম 'ঘোষ্ট', জাপান সমুদ্রে চলেছে শীল মাছ শিকারে।

—আমার নাম মুগরিজ, বন্ধু বলে জানবেন। একজন এগিয়ে এসে বলে।

—এখনো ক্যাপ্টেনের পাল্লায় পড়ে নি তো। কে একজন ফোড়ন কাটে।

হঠাৎ সবাই চঞ্চল হয়ে উঠে। ক্যাপ্টেন উলফ লরসন দৃঢ় পদে এগিয়ে এসে কঠিন দৃষ্টিতে ওয়েডেনের দিকে তাকায়। চোখে মুখে কুটিলতা আর নিষ্ঠুরতার ছাপ স্পষ্ট।

তুমি কি কর হে?

—আমি সাহিত্য সমালোচক। আর বাবা বেশ কিছু টাকা পয়সা রেখে গেছেন।

—অর্থাৎ অকর্মা। ছ'চোখের বিষ ওরা। মানুষকে সব সময় কাজ করতে হবে। কাউকে আমি বিনে পয়সায় খাওয়াতে পারব না।

—আমার সঙ্গে টাকা রয়েছে।

—টাকার গরম দেখিও না। আজ থেকে পাচকের কাজ করবে। পাঁচ ডলার মাইনে। যাও রান্নাঘরে। ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিয়ে চলে যায়।

ওয়েডেন বিমর্ষ হয়ে অনন্যোপায়ে রান্নাঘরে কাজ করে। মুগরিজ তার ওপর খবরদারি করে। ভাল লাগে না তার। অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে অনেক খবর পায়। লোকটা নিষ্ঠুর। অনেকেরই ধারণা জাহাজে যত লোক আছে শেষ পর্যন্ত তত জন থাকবে না। ক্যাপ্টেনের শিকার হবে অনেকে। তবু এরা এসেছে অর্থ উপার্জনের জন্য।

নীল সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভেসে চলেছে। অসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওয়েডেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তীরের রেখা পর্যন্ত দেখা যায় না। সারা জীবন কি এই জাহাজের রান্নাঘরেই কাটবে? হঠাৎ একটা হৈ চৈ শুনে ডেকে ছুটে আসে। অনেকে মিলে একটা মোটা কাছি সমুদ্রে নামিয়ে হল্লা করছে। এককোণে লিচ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলে—জনসনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সমুদ্রের জলে চোবানো হচ্ছে।

—কেন? বিস্মিত হয়ে ওয়েডেন জিজ্ঞেস করে।

—শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরো একটি কোট চেয়েছিল সে।

—না, কথা কাটাকাটির সময় সে হঠাৎ ক্যাপ্টেনকে একটা ঘুষি মারে।

নাবিকদের হল্লায় ওয়েডেনের কথা ঢাকা পড়ে যায়। প্রত্যেকের মুখে ভয়ের ছাপ। হাঙর তাড়া করেছে। সবাই কাছি ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নেবার জন্য ছুটে যায়। নীচ থেকে জনসনের আর্তনাদ ভেসে আসে। ব্যাকুল হয়ে ওয়েডেন ছেড়ে দেওয়া কাছিটা চেপে ধরে। লিচের সাহায্যে যখন জনসনকে ডেকে টেনে তোলে তখন তার একটা পা হাঙরে কেটে নিয়ে গেছে।

—বাঃ, আর কোনও দিন পালাতে পারবে না। হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন বলে।

ওয়েডেন বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকায়। চোখের কোণে ক্রূরতা চিকচিক করছে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—যে শয়তানি করবে তার এই শাস্তি।

তার কথা শুনে শিউরে ওঠে ওয়েডেন। সমুদ্রের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে। মুক্তির বুঝি কোনও আশা নেই। সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ছোট ঘরটা, যেখানে বসে সে সাহিত্য সমালোচনা লিখত, চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। শীলমাছের বিরাট একটা আস্তানার খোঁজ পাওয়া গেছে। সমুদ্রের বুকে নেমে পড়ে ছোট ছোট নৌকো। নৌকোগুলো বিস্তৃত অঞ্চল ঘিরে ধরে অতর্কিতে আক্রমণ করতে মাছের ঝাঁকের ওপর। সকালবেলায় নৌকোগুলো বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যের সময় ফেরে অসংখ্য মাছ নিয়ে। ক্যাপ্টেনের লোভাতুর চোখ চকচক ক'রে ওঠে।

একদিন একটা নৌকো ফিরল না। জনসন আর রবার্ট সে নৌকোয় ছিল।

—ওরা পালাল? দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে ক্যাপ্টেন বলে।

—ভালই করেছে।

—কী বললে? অগ্নিবর্ষী চোখে ওয়েডেনের দিকে তাকায় ক্যাপ্টেন।

—ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হুঁশিয়ার হয়ে কথা বল। মুগরিজ হাতে একটা ছুরি নিয়ে সাবধান করে।

আলু কাটার ছুরিটা বাঁহাতে ঘষতে ঘষতে ওয়েডেন বলে—এই নরক থেকে যে যাবে সে বাঁচবে।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মুগরিজ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওয়েডেনও তৈরী ছিল। মুহূর্তে দু'জনের লড়াই বেধে যায়। ইস্পাতের ফলা দু'টো মুহূর্তের মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে। একপাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন আরামে সিগারেট টানতে থাকে। হঠাৎ ওয়েডেন চিৎকার ক'রে পড়ে যায়। ডান হাতের কনুই থেকে তীর বেগে রক্ত ছুটছে। সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন চিৎকার ক'রে ওঠে—জাহাজের মুখ ঘোরাও।

তীর বেগে ছুটে চলেছে জাহাজ। দূরে একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে। আরো জোরে ছুটে চলে জাহাজ। নৌকোটার কাছে আসতেই লাফিয়ে পড়ে সশস্ত্র পাঁচ জন। নৌকোয় পাঁচজন আরোহীকে ধরে নিয়ে আসা হয়। চার জনকে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কাজে বহাল করা হয়। পঞ্চম জন মহিলা, মৌদ ব্রিউস্টার, একজন লেখিকা।

—ভালই হ'ল, দু'জনের বদলে পাঁচজনকে পেলাম।

—কিন্তু মিস ব্রিউস্টার তো জাহাজের কাজ করতে পারবে না।

—আমি কাউকে বিনে পয়সায় খাওয়াতে পারব না। কিছু না পারুক কয়লা ভাঙবে।

কথাটা শুনে চমকে ওঠে ওয়েডেন। একজন মহিলারও নিস্তার নেই তার হাত থেকে। লোকটার কি দয়া মায়া বলে কিছু নেই? তার দিকে তাকালেই মনে হয় একটা হিংস্র সাপ বুঝি হিস্ হিস্ ক'রে লকলকে জিব বের ক'রে ছোবল দেবার চেষ্টা করছে।

—হেই! হৈ, হৈ!!

সবাই এসে ডেকে দাঁড়ায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জনসন আর রবার্টকে নৌকোর মধ্যে। নৌকোটা ফুটো হয়ে গেছে, ঝড়ে পাল ছিঁড়ে গেছে। কেবল ঘুরপাক খেয়ে চলেছে নৌকোটা।

—এখুনি ওদের উদ্ধার করা দরকার। ওয়েডেন বলে।

দু'একজন একটা নৌকো খুলতে এগিয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন গম্ভীর হয়ে আদেশ করে—কেউ নৌকো নামাবে না।

সবাই স্থির হয়ে দেখছে, একটি নৌকো ধীরে ধীরে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। দু'টি অসহায় মানুষের আর্ত চিৎকার প্রত্যেকের মনে এসে নাড়া দেয়। সবাই কেমন ছটফট করতে থাকে। ক্যাপ্টেন লরসন উল্লাসের সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে ওঠে নৌকোটি একদম ডুবে যেতেই।

—কি নিষ্ঠুর! চোখ দু'টো দু'হাতে ঢেকে কেঁদে ওঠে মিস ব্রিউস্টার।

—শুধু নিষ্ঠুর নয়, শয়তান। ওয়েডেনের চোখে মুখে ঘৃণা ফুটে ওঠে।

—এর কোনও প্রতিকার নেই?

কথাটা শুনেই ওয়েডেন চমকে ওঠে। সত্যি কি এর প্রতিকার নেই? দিনরাত এক চিন্তায় বিভোর হয়ে ওঠে। উলফ লরসেনের হাত থেকে নিস্তার পেতেই হবে। দিনে দিনে মৌদের সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। বার বার দু'জনে মিলে পরামর্শ করতে থাকে।

তারপর একদিন রাতে সবার অলক্ষ্যে একটি নৌকো ভাসল সমুদ্রের বুকে। আরোহী ওয়েডেন আর মৌদ। জোরে দাঁড় বেয়ে চলে, কেউ যেন টের না পায়। ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। কখনো ঢেউয়ের মাথায়

কখনো নীচে, যেন ছোট্ট একটি মেয়ে নেচে নেচে চলেছে।

দিন দু'য়েক বাদেই শুরু হয় ঝড়। নৌকো একদিকে হেলে কাৎ হয়ে গেছে। হাল ধরে ঠিক মত রাখা যাচ্ছে না। মৌদের হাত ছিড়ে গেল বুঝি। দাঁড় টেনেও ওয়েডেন এতটুকু এগোতে পারছে না। প্রচণ্ড ঝাপ্টায় একটা ঢেউ আছড়ে পড়ে নৌকোর বুকে। ডুবে যায় যায়। মৃত্যু নিশ্চিত। না, আবার ভেসে উঠেছে। আবার জীবনের আশা। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওরা। কিন্তু জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে নৌকো ছুটে চলেছে। আর ধরে রাখার সাধ্য হয় না ওদের। মৃত্যু এসে গেছে। মুহূর্তেই সলিল সমাধি হবে দু'জনের। হঠাৎ ডাঙায় আছড়ে পড়ল নৌকোটি।

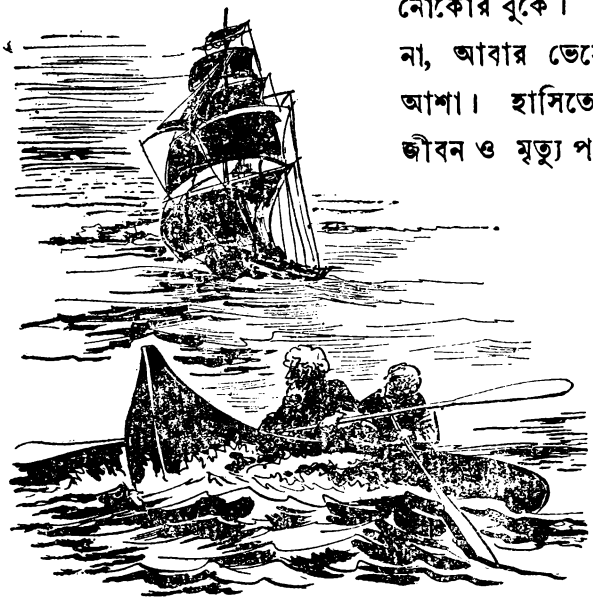

একটা নির্জন দ্বীপের বুকে আশ্রয় পেল তারা। মানুষের জীবন কি বিচিত্র। অর্থ, সম্পদ, সভ্যতা সব অর্থহীন তাদের কাছে। কোনও রকমে কুঁড়ে ঘর তৈরী ক'রে থাকে। সমুদ্রের দিকে অনন্ত আশা নিয়ে চেয়ে থাকে, যদি কোনও জাহাজ দেখা যায়।

সত্যি সত্যি একদিন একটা জাহাজ দেখা গেল। উল্লসিত হয়ে ছুটে গিয়ে স্তম্ভিত হ'ল মাস্তুল ভাঙা জাহাজটা দেখে। ক্যাপ্টেন লরসেনের 'ঘোষ্ট'। তার এই অবস্থা! ভেতরে ঢুকে আরো অবাক। কোনও মানুষ জন নেই। খুঁজতে খুঁজতে দেখে ক্যাপ্টেন এক কোণে বসে রয়েছে। তাদের দেখেই উঠে দাঁড়ায়। তার জাহাজ লুণ্ঠিত হয়েছে। সব নাবিকদের ধরে নিয়ে গেছে। জাহাজের মাস্তুলটা ভেঙ্গে দিয়েছে।

—কী আর করা যাবে। এটাকে এখন ভাল করতে হবে।

—না। আমার জাহাজে হাত দেবে না। মেজাজ দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বলে।

—আমাদের বাঁচতে হবে। তোমার মেজাজের তোয়াক্কা করি না।

—খবরদার। ক্যাপ্টেন গর্জে ওঠে। তারপর মুহূর্তে ওয়েডেনের ওপর শিকারী কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ওয়েডেনও পাল্টা আক্রমণ করে। শুরু হয়ে যায় দু'জনের ধ্বস্তাধ্বস্তি। জাহাজটা বার বার কেঁপে ওঠে। ক্যাপ্টেনকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। হঠাৎ হাত একটু আলগা হতেই ক্যাপ্টেন ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পা পিছলে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যায়। ক্লান্ত ওয়েডেন আর মৌদ দেখে, লরসেন সাঁতার কেটে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু এক একটা ঢেউ এসে তাকে অনেক দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এক একবার ডুবছে, আবার ভাসছে। মৃত্যুর বিভীষিকায় তার চোখ মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ডুবে গেল।

—একটা শয়তানের মৃত্যু হ'ল। ওয়েডেন অস্ফুট স্বরে বলে।

—চিরদিনই অসতের মৃত্যু হয়, সৎ জয়ী হয়। মৌদ বলে।

—বোধহয় তাই। সেইজন্য মনুষ্য সমাজ আজও টিঁকে আছে।

পরম উৎসাহে দু'জনে জাহাজ মেরামতের কাজে লেগে যায়। তারপর ভেসে পড়ে একদিন নীল সমুদ্রে, পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়ে পঞ্চু দেখলে কি যেন একটা জিনিস ঝিম ধরে পড়ে আছে। চারদিক অন্ধকার অপরিষ্কার স্যাঁতসেঁতে মাটির থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। চারদিকে আরশোলার নাচ। কিন্তু তারই মধ্যে যেন কী একটা নড়ছে।

পঞ্চু ধীরে ধীরে উঠলো। তারপর একটা ভাঙ্গা জায়গা একটু জোরে চাপ দিতেই আরো একটু যখন ভেঙ্গে গেল, তখন তারই মধ্যে দিয়ে ঢুকে দেখলে—সেই ছাগলটা। মরার মত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। নড়তেও পারছে না, চড়তেও পারছে না। পঞ্চু ওটাকে কোলে তুলে নিলো। তারপর পেছনের জানালা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

এদিকে ভুরকুটানন্দ তো ঘরে এসে অবাক। এদিক ভাঙ্গা ওদিক ভাঙ্গা। কি ব্যাপার? আরো লক্ষ্য করতে করতে সে দেখলো দরজা ভাঙ্গা, ঘরে ঢুকেই তার চোখ একেবারে ছানাবড়া। ছাগলটা কোথায়?

চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। ওরা সমানে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। কিন্তু ছাগল কোথাও নেই। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সে কোথাও নেই।

—চ্যাং, ও চ্যাং। সে চিৎকার করতে লাগলো। সর্বনাশ হয়ে গেছে দেখ এস।

—কী, কী হলো? সে ছুটে এলো!

—যা হবার তাই হয়ে গেছে। ছাগলটা চুরি হয়ে গেছে। ভুরকুটানন্দ কেঁদে ফেললো।

—কি করে? অবাক হয়ে চ্যাং বললে।

—কী করে আবার! যে লোকটা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে সে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে নিশ্চয়, নইলে ওটা গেল কোথায়। এখুনি তো দেখেছি ঝিমোচ্ছে।

চ্যাং বললে: সর্বনাশ! তবে ওই পঞ্চুই নিয়েছে।

—তোমরা এখুনি বেরিয়ে পড়। যেমন করেই হোক ছাগলটা আবার ফিরিয়ে আনাই চাই, যেমন ক'রে হোক।

চারদিকে লোক পাঠাও। আমি সে ছাগল চাই-ই।

চ্যাং লোকজন নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লো।

পঞ্চু ছাগলটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে ছুটতে লাগলো প্রাণপণে। তারপর টেনিদার আস্তানার দিকে রওনা হলো।

কিন্তু পেছনে যেন কারা অনুসরণ করছে বলে মনে হলো। পঞ্চু একটা পানা পুকুরের পাশে একটা ঝোপের ভেতর গিয়ে বসলো।

কিন্তু ছাগলটা ভীষণ ছটফট করছে। ও আর কিছুতেই চুপ ক'রে বসে থাকতে চাইছে না। কাজেই পঞ্চু আবার বেরিয়ে পড়লো এবং ছুটতে লাগলো।

ভুরকুটানন্দ যে পাজী লোক। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই লোক পাঠিয়েছে খুঁজতে। আর চ্যাং যে ভীষণ ধূর্ত, সেও নিশ্চয়ই প্রাণপণে এ কাজে লেগে পড়েছে। যদি ধরে ফেলে তবে আর রক্ষে নেই। পালাতেই হবে যেমন করেই হোক।

ও আবার ছুটতে লাগলো। কোথাও বসার উপায় নেই—কোথাও দাঁড়াবার

উপায় নেই। ছাগলটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। বেশী কিছু করলেই হয় তো ছুটে পালাতে চেষ্টা করবে, তা হলেই বিপদ। পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসে টেনিদার আস্তানায় পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো।

এদিকে আকাশ কালো ক'রে বিষ্টি এলো। ওপারের গাছপালাগুলো ক্রমে ক্রমে ঝাপসা হয়ে এলো। গাছপালার মাতামাতি। এ অবস্থায় ছোটা চলে না। সে একটা গৃহস্থবাড়ীর বারান্দার ওপর ওঠে দাঁড়াল।

ছাগলটা কেবলই ছটফট করছে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো এক বুড়ো। জীর্ণ-শীর্ণ—কেবল খক্ খক্ ক'রে কাশছে।

—তোমার কোলে ওটা কী বাবা?

—ছাগল! পঞ্চু বললে।

—ছাগল? ছাগল দিয়ে কী হবে?

—ব্যবসা করবো।

—ও।

—তা কিনলে কোত্থেকে?

—হাট থেকে। পঞ্চু বললে।

—কত হলো?

—পঞ্চাশ টাকা।

—বড্ড দাম নিয়েছে। ওই মরাখেকো ছাগল। ও তো বাঁচবেই না। ওকে কিনলে কেন?

—কিনলাম। ইচ্ছে হলো।

—ও। বুড়ো চুপ করলো।

বিষ্টি আরো জোরে এলো। সঙ্গে জোর হাওয়াও বইতে লাগলো। জলের ছাঁট এসে পঞ্চুর গা কাপড় আর ছাগলটাকে ভিজিয়ে দিতে লাগলো।

বুড়ো বললে: ঘরের মধ্যে এসে বস না। বিষ্টির ছাঁটে যে তোমরা ভিজে যাচ্ছো।

—না! থাক। পঞ্চু বললে।

থাকবে কেন? বস বস। আমি একটা পিঁড়ি আনি। বুড়ো একটা

পিঁড়ি এনে পঞ্চুকে বসতে দিলো। এদিকে না বসেও উপায় নেই। বিষ্টি হচ্ছে সঙ্গে জোর হাওয়া বইছে। জলের ছাঁট এসে সমস্ত বারান্দাটা ভিজে গেল। বাধ্য হয়ে বুড়োর ঘরের মধ্যে পঞ্চু এসে বসলো।

বিষ্টি আরো জোরে এলো আকাশ কালো করে। এদিকে ছাগলটা বড্ড ছটফট করছে ভয়ে। ক'দিন ধরে ওর ওপর যা চলেছে তার আর ঠিক নেই। খাওয়া নেই দাওয়া নেই ভুরকুটানন্দ ওকে দিয়ে ক্রমাগতই টাকা রোজগার করাবার ফিকিরে ছাগলটি নিয়েছে। গলা দিয়ে সোনা তুললে ছাগলটার ভারি কষ্ট হয়। সে ভারি অসুস্থ বোধ করে কিন্তু কার কথা কে শোনে। তারা ব্যবসায়ী লোক। টাকাই তাদের দরকার। কারু কষ্ট হচ্ছে কী না হচ্ছে, সে কথায় ওদের কাজ কী। সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যেই একে না খাওয়ায় তাতে ব্যবসার পরিশ্রমে ছাগলটা প্রায় মর-মর। কিন্তু মরে গেলে ভুরকুটানন্দের ক্ষতি কি? ছাগলটা তো আর তার কিছু নয়। যে স্বপ্নে পেয়েছে ক্ষতি হবে তারই যদি কোন মতে ওটা মরে যায়। কাজেই যতদিন বাঁচে তার হাতে যখন ওটা এসে পড়েছে। তখন সে টাকা রোজগার ক'রে নেবে। আর নেবেই বা না কেন? কি অবস্থা ছিল তার ব্যবসার।

একেবারেই চলতো না। প্রায় উঠে যাবার উপক্রম। হোটেলে আর লোক আসে না। তার অবস্থা প্রায় কাহিল হয়ে গিয়েছিল। ওই ছাগলটা পেয়ে তবেই ওরা বাঁচলো। কাজেই ছাগলটা তো তাদের নয়। তারা পায়ও নি। চুরি ক'রে এনেছে। কাজেই যতদিন পারে, যত বেশী পারে আদায় করে নেবে। নইলে তাদেরই লোকসান।

সুতরাং ছাগলটার এই হাল হয়েছে। মরে গেলেই বা তার কী। দেবে টেনে ফেলে।

বুড়োটা বাড়ীর ভেতর চলে গেল। ঘরের ভেতরে বসে বসে পঞ্চু ভাবতে লাগলো। ভারি জোরে বৃষ্টি এলো। এভাবে বসে থাকা কখনই উচিত নয়। বুড়োর মনে কি আছে কে জানে সুতরাং তার চলে যাওয়া উচিত কি না কে জানে।

একবার মনে করলো চলেই যাবে সে। কিন্তু এতো ঝড় বৃষ্টিতে বেরোনো দায় কাজেই বসেই রইলো।

এবার সে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলে। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব-পত্র

নেই। একটা তক্তোপোষ পাতা ঘরের এক কোণে। তার ওপর একখানা চাদর পাতা। মনে হয় বুড়ো ওখানেই শোয়। এক কোণের দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানা কালীর পট। আর ঘরের কোণে একটা জলের কলসী রাখা।

মনে হয় বুড়োর আর কেউ নেই। সে ঘরে একাই থাকে। আর তার অবস্থাও বেশী ভাল না। ঘরে কোন আসবাব-পত্র নেই।

পঞ্চু মনে মনে ভাবলে বুড়ো সেই কখন গেছে বৃষ্টির মধ্যে। গেল কোথায়? আসে না কেন? এলেই সে চলে যাবে। আর এখানে থাকা উচিত নয়। কি জানি কার মনে কি আছে।

হয়তো বুড়ো কিছু একটা আন্দাজ করেছে। হয়তো ভুরকুটানন্দের সঙ্গে তার যোগ আছে। কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়তো বা এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে ভিজে সে ভুরকুটানন্দ অথবা চ্যাংকে ডেকে আনতে গেছে। কিংবা চ্যাং নিকটে কোথাও লুকিয়ে আছে। কিছুই আশ্চর্য নয়। আর এতে অবাক হবার মতই বা কি আছে। ছাগলটা চুরি গেছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণ তারা ভীষণ খোঁজাখুঁজি করছে। এবং এখানে এসে পড়াও কোন বিচিত্র নয়, সুতরাং আর অপেক্ষা নয়, এই বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়া যাক। নইলে হয়তো বিপদ হতে পারে।

মনে করে সে সেই দরজার কাছে এলো পালাবার জন্যে। ঠিক এমনি সময় দরজার কাছে একটা ছায়া পড়লো। এবং কারা যেন এসে সশব্দে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল!

পঞ্চু একেবারে চমকে উঠলো। এতটা যে ঘটবে সে কখন আশাও করে নি। (ক্রমশঃ)

আগামীকাল

কমলেশ সিংহরায় (অনুবাদক)

ছোটদের জন্য লিখিত একটি বিদেশী হাসির গল্প অনুবাদ ক'রে তোমাদের শোনাচ্ছি। আশাকরি, ভাল লাগবে।

অনেকদিন আগেকার কাহিনী। একদিন এক দর্জির দোকানে একটি খদ্দের এসেছিল তার টুপি তৈরী করাবার জন্যে। দর্জি সাদরে তার টুপি ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। বললো—আগামীকাল এলে টুপিটি পেয়ে যাবেন। এরপর খদ্দের ভদ্রলোক প্রতিদিনই একবার ক'রে খোঁজ নিয়ে যায় যে, তাঁর টুপী তৈরী হয়েছে কিনা। দর্জি তখন খদ্দেরটিকে প্রত্যহই বলে যে, টুপিটি আগামীকাল পাবে।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন, তারপর সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিয়ে মাসও চলে গেল। একদিন টুপিপ্রস্তুতকারক কোন কাজে দোকান থেকে কি একটি কাজে বাইরে বেরিয়েছে, এমন সময় সেই খদ্দেরটি দোকানে এসে হাজির। তখন ওই দোকানের একটি কর্মচারী সেই খদ্দেরটির সঙ্গে কথা বললো। দর্জি তখন আবার দোকানে ফিরে এলো। তখন কর্মচারীটি বললো—বাবু, সেই খদ্দেরটি আজ আবার এসেছিল।

এইকথা শুনে দর্জি তাকে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি তাকে কি বলেছ?"

দোকানের সামনেই ছিল একটা কাটা-গাছের গোড়া। কর্মচারীটি সেইদিকে একবার চতুর দৃষ্টিতে তাকাল ও সাহসের সঙ্গে বলল, "আমি খদ্দেরটিকে বলেছি যে-টুপিটা তিনি তৈরী করতে দিয়ে গেছেন, সেটা তখনই পাবেন, যখন এই কাটা-গাছের গোড়াটা আবার একটি পূর্ণ গাছে পরিণত হবে এবং ফলদান করবে।"

কথাগুলো শুনে দর্জি দারুণভাবে রেগে গেল ঐ কর্মচারীটির উপরে এবং হাতের কাঁচিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। বলল—"তোমার কি সাহস, তুমি এই ধরণের এক প্রতিজ্ঞা করেছ গোঁয়ারের মত? হয়ত এই কাটা গোড়াটা কোনদিন গাছে পরিণত হবে, হয়ত বা ফলদানও করবে; কিন্তু এ কথাটা তোমার মাথায় এলো না যে, 'আগামী-কাল' তো কখনও শেষ হবে না।"

[ইহা লিওনিদ্ গুরুনৎস রচিত 'টু-মরো' নামক শিশুগল্পের অনুবাদ]

পদ্মপরী

মুরারীমোহন বিট

বিদেশ ভ্রমণ সাঙ্গ ক'রে এক বছর পর রাজকুমার বিশ্বদেব স্বরাজ্যে ফিরছে, তাই বিশালনগর রাজ্যে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। রাজ্যের নানাস্থানে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে শুরু ক'রে নগরের তোরণদ্বার অবধি প্রধান রাজপথ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই পথ দিয়েই আনা হবে রাজকুমারকে। আজ দ্বিপ্রহরে তার রাজধানীতে পৌঁছানর কথা। গত পরশু প্রতিবেশী কাঞ্চনপুর রাজ্যের দূত এসে বিশালনগরাধিপতিকে জানিয়ে গেছে, রাজকুমার বিশ্বদেব তাদের রাজ্যে অতিথি হয়ে রয়েছে—সে সরাসরি ওখান থেকে একা রওনা হয়ে স্বরাজ্যে ফিরবে। কাঞ্চনপুররাজ বিশ্বদেবকে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে বিশালনগর রাজ্যে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করায় রাজকুমার তা প্রত্যাখ্যান ক'রে জানিয়েছে, সে যেমন একা বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল, তেমনি একাই আবার দেশে ফিরবে। দূতের কথা অনুযায়ী আজ ঠিক দুপুরেই রাজকুমারের পৌঁছানর কথা।

মহারাজ পুত্রকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যথাসময়ে একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক সৈন্যকে তোরণদ্বার অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে রইল অতি সুসজ্জিত একটি হস্তী। ঐ হস্তীর পিঠে চেপে আসবে রাজকুমার বিশ্বদেব।

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেল, তবু রাজকুমারের দেখা নেই। চিন্তান্বিত ও অধৈর্য হয়ে উঠল সৈন্যগণ।

তারপর সন্ধ্যা হ'ল ··এক প্রহর রাত অতিক্রান্ত হয়ে গেল—রাজকুমার এল না। তখন সৈন্যগণ অত্যন্ত দুঃখিত মনে ফিরে এল রাজার কাছে।

রাজামশাই তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সৈন্যাধ্যক্ষকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন,—তোমরা প্রচুর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আগামীকাল ভোরেই কাঞ্চনপুর রওনা হও। বিশ্বদেবকে পাওয়া না গেলে কাঞ্চনপুর আক্রমণ করবে, এবং রাজাকে বন্দী ক'রে নিয়ে আসবে আমার কাছে। তারপর যা করার আমি করব।

পরদিনই কয়েক সহস্র সেনা কাঞ্চনপুর অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে প্রধান সেনাপতি কাঞ্চনপুররাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিশ্বদেবের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বিশ্বদেব বিশালনগরে পৌঁছায় নি শুনে রাজা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে বললেন,—রাজকুমার তো ঠিক সময়েই এখান থেকে রওনা হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি পথিমধ্যে কোন বিপদে পড়লেন?

সেনাপতি ভাবলেন, রাজার এসব মিথ্যা কথা। রাজকুমারের খবর রাজা নিশ্চয়ই জানেন। যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক, কাঞ্চনপুররাজ বিশ্বদেবকে বন্দী ক'রে রেখেছেন। এই ভেবে তিনি কাঞ্চনপুর আক্রমণ করলেন।

তিনদিনের যুদ্ধেই কাঞ্চনপুররাজ পরাজয় স্বীকার করলেন এবং বন্দী হলেন। কিন্তু সারা কাঞ্চনপুর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও রাজকুমার বিশ্বদেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এবার বিশ্বদেবের কথা বলা যাক।

বিশ্বদেব স্বরাজ্যে ফেরার জন্য ঠিক সময়েই রওনা হয়েছিল। চলতে চলতে সন্ধ্যার সময় সে পৌঁচেছিল এক নির্জন অরণ্যের ধারে। অরণ্যের কোলে একটি পুরাণো শিবমন্দির, মন্দিরের সামনে স্বচ্ছ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীতে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।

রাজকুমার ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে মন্দিরের চাতালে উঠে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশ, অরণ্য প্রান্তর, শিবমন্দির সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। পুষ্করিণীর দিকে চোখ পড়তে রাজকুমার অবাক হয়ে গেল। দেখল পুকুরের সিঁড়ির কাছটা মৃদু গোলাপী রঙের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে। আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তারপরই রাজকুমার যা দেখতে পেল তাতে খুব অবাক হয়ে গেল। দেখল, সিঁড়ির কাছাকাছি

বিরাট একটা পদ্মফুলের ওপর অপূর্ব সুন্দরী একটি কন্যা বসে রয়েছে। দেখে বিশ্বদেব যেন আর চোখ ফেরাতে পারে না। এমন সুন্দরী মেয়ে এর আগে সে আর কখনো দেখে নি। মেয়েটির পরিচয় নেবার জন্য সে পুকুরের সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করল,—তুমি কে ?

মেয়েটি হেসে বলল,—আমার কথা পরে হবে। তোমার পরিচয় আগে জানাও।

বিশ্বদেব নিজের পরিচয় দিল এবং বলল,—তুমি যে-ই হও, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

পদ্মফুলের কন্যা বলল,—তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর, আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করব। বিয়ে আমাকে করতে পার, কিন্তু বিয়ের পর আমাকে তুমি কাছে পাবে না—এমন বিয়েতে কি তুমি রাজী আছ ?

রাজকুমার ভাবল, মেয়েটি বোধহয় তামাসা করবার জন্য তাকে একথা বলছে। বিয়ে হবে অথচ বউকে পাওয়া যাবে না, এমন কি হয় কখনো ? বিশ্বদেব তাই তাড়াতাড়ি উত্তর দিল,—হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করতে রাজী আছি। তোমায় পাব কি পাব না সে পরের কথা।

মেয়েটি তখন পদ্ম থেকে নেমে পুকুরের পাড়ে বিশ্বদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর মহাদেবকে সাক্ষী রেখে আংটি বদল ক'রে গন্ধর্ব মতে দু'জনে বিয়ের পর্ব শেষ করল। তারপর সেই অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বলল,—এবার তাহলে আমাকে বিদায় দাও। আমি মানুষ নই, আমি পরীর মেয়ে। অনেকদিন আগে আমি একবার পিতার এমন অবাধ্য হই যে, পিতা রাগ ক'রে আমাকে এই অভিশাপ দেন যে, আমি পুকুরের জলে পদ্মফুল হয়ে ফুটে থাকব। পুকুরের জল ছেড়ে আমার আর কোথাও যাবার ক্ষমতা থাকবে না। যদি কোনদিন কোন রাজকুমার আমাকে পাওয়ার আশা নেই জেনেও আমাকে বিয়ে করে, তবেই আমি মুক্তি পেয়ে মা-বাপের কাছে আবার ফিরে যেতে পারব। এবার তাহলে চলি রাজকুমার ?

বলতে বলতে পরীর মেয়ের পিঠে রামধনু রঙের দু'টি সুন্দর ডানা গজিয়ে উঠল। অমনি সে ডানা দু'টি মেলে দিল নীল আকাশের গায়ে। বিশ্বদেবও তৎক্ষণাৎ দু' হাত দিয়ে পরীর একখানা পা চেপে ধরল।

পরীর মেয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করল রাজকুমারকে পা ছেড়ে দেবার জন্যে, কিন্তু বিশ্বদেব ছাড়ল না, সে তেমনিই জাপটে ধরে রইল পরীকে।

পরীকন্যা কি আর করে, বিশ্বদেবকে নিয়েই এসে হাজির হল আকাশে তাদের মেঘের রাজ্যে। পিতামাতাকে বিশ্বদেবের সমস্ত কথা সে জানাল। শুনে পরীর বাবা বিশ্বদেবকে বললেন,—তোমার সাহস এবং আমার মেয়ের প্রতি তোমার ভালবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার মেয়েকে না পেলে তোমার জীবন নষ্ট হতে পারে, এই ভেবে তোমার হাতে আমার মেয়েকে ছেড়ে দিচ্ছি। ওকে তোমার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করো গে। তোমাদের দু'জনকে মর্ত্যে পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি।

এই বলে তিনি একখানি অতি সুন্দর ফুলের রথ এনে ওদের দু'জনকে বসতে বললেন। ওরা বসতেই রথ শোঁ-শোঁ ক'রে নীচের দিকে নামতে লাগল। রথের সারথি নেই—রথ নিজেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওদের দু'জনকে পৌঁছে দিল বিশালনগর রাজপ্রাসাদের দ্বারে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল দিগ্বিদিক।

———

কাঠ বেড়ালি

শ্রীপ্রদীপকুমার রায়

কাঠ বেড়ালি, কাঠ বেড়ালি,
দৌড়ে সারা মাঠ বেড়ালি,
বেশ মজা তোর, জন্ম থেকেই
লেখা-পড়ার পাট এড়ালি।

চোখ ঘুরালি, গাল ঘুরালি,
কড়াই, ছোলা, চাল কুড়ালি ;
যখন খুশী চড়লি গাছে,
ফল, পাতা আর ডাল মুড়ালি।

মুখের কাছে মুঠ বাগালি,
ল্যাজ তুলে পুট পুট তাকালি ;
দশটা বাজার ঘণ্টা শুনেই
মায়ের কাছে ছুট লাগালি!

———

বিলেতের চিঠি

অভিজিৎ বসু

ভাই 'কলরব',

আবার এক মাস পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কেমন, ভাল আছ তো?

আজ মেঘলা মনে ঘুম থেকে উঠে মেঘলা আকাশ দেখে মনটা যেন আরও মেঘলা হয়ে উঠল। এমন সময় এলে তুমি,—পিওন পৌঁছে দিয়ে গেল। তাতে করে মনের মেঘলা ভাবটা কিছুটা কাটল।

ইংল্যাণ্ডে গ্রীষ্মকালেও যা ঠাণ্ডা, তা আমাদের দেশের শীতকালের মত। গরমকালে তবু কিছুটা ভাল আবহাওয়া পাওয়া যায়, সূর্যের মুখ দেখা যায়। কিন্তু আজ সকাল থেকে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বেরোবার সময় দিদি বললেন ছাতা নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি ভাবলাম, ইংল্যাণ্ডে এসে বৃষ্টিকে ভয় করলে চলবে কেন? ভাগ্যক্রমে অল্পক্ষণ দাঁড়ানোর পরেই একটা বাস পেয়ে গেলাম।

এখানে সকাল আর বিকেলে বাসে একটু ভিড় হয়। তাই অনেক সময় হেঁটেই স্কুলে যেতে হয়। রাস্তাটা চেনা, তবে এখানকার রাস্তা বড় অসমতল—কখনও পাহাড়ে উঠছে কখনও পাতালে নামছে। এজন্যে এখানে রাস্তা হাঁটা বেশ কষ্টকর মনে হয় মাঝে মাঝে।

যাইহোক, বাস ভাড়া লাগে পাঁচ পেনি। অর্থাৎ নব্বই পয়সা। অবশ্য এখানকার হিসেবে সস্তাই। এখানে এখন নতুন হিসেবে অর্থাৎ মেট্রিক সিস্টেমে টাকা পয়সা চালু হয়েছে, ঠিক আমাদের দেশের মতই। ১০০ পেনিতে এক পাউণ্ড, —শিলিং এখন বাতিল।

বাস থেকে নেমে খানিকটা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে স্কুলে যতে হয়। সকালবেলা সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে চলতে বেশ লাগে। যেদিন যেদিন রোদ্দুর ওঠে আর সাদা মেঘ ছেয়ে থাকে আকাশে, সেদিন অনেক জেট প্লেনের ধোঁয়ার রেখা দেখা যায়। এখানে বোধহয় জেট প্লেন খুব চলে, প্রায় রোজই চার-পাঁচটা দেখতে পাই।

ইংল্যাণ্ডে ঠাণ্ডা হাওয়া বড্ড বেশি দেয়। আর সেইজন্যেই বেশি ঠাণ্ডা লাগে।

নইলে এমনি এখন খুব বেশি ঠাণ্ডা নয়। জার্মানিতে নাকি এর থেকে অনেক বেশি ঠাণ্ডা, কিন্তু সেখানে এমন ঠাণ্ডা হাওয়া দেয় না। লণ্ডনের হাওয়ার গন্ধ কলকাতার মত নয়। এতে যেন অন্যরকম গন্ধ। তবে বৃষ্টি পড়লে প্রায় কলকাতারই মত গন্ধ পাওয়া যায়। তখন ভাবি মন কেমন করে কলকাতার জন্যে। এখানকার মেঘগুলো কিন্তু কলকাতার মেঘেরই মত। তাই মাঝে মাঝে মেঘেদের দেখে মনের দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করি।

এবার আমার স্কুল সম্বন্ধে কিছু বলব।

আমার স্কুলের নাম 'ক্লাইস্টস্ কলেজ'। গত ২৫শে এপ্রিল থেকে আমার স্কুল শুরু হয়েছে। প্রথম দিন দিদির সঙ্গে গাড়ি করে স্কুলে গেলাম। প্রথমে স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হল। তিনি একজন মহিলা। আমাকে দেখিয়ে দিদিকে বললেন—'এই বুঝি আপনার ভাই? কতদিন ধরে এর আসবার কথা শুনছি, আমরা তো ভাবিই নি ও কোনদিন আসতে পারবে!' যাই হোক, দিদি তো গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

সেক্রেটারির অফিসে কিছুক্ষণ বসবার পর হেডমাষ্টার (মিঃ ডি. সি. নাইট) মশাই এসে আমাকে ক্লাস দেখাতে নিয়ে গেলেন। তাঁকে বেশ ভালই লাগল।

ক্লাসে দু-জন ছেলের সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। একজন ভারতীয়, নাম সুবোধ প্যাটেল, জাতে গুজরাটী। আর একজন পাকিস্তানী, নাম নরিস আবদুল্লা।

প্রথম দিন ডিনারের পর ছুটি হয়ে গেল। পরে জানতে পেরেছিলাম সেদিন ছিল 'গেম ডে'। প্রতি বুধবারে 'গেম ডে' হয়। তবে, প্রথম দিন বলে সেদিন খেলি নি। পড়ার মত খেলাও এখানে কমপালসারি বা অবশ্য করণীয়।

এখানে স্কুলে ছটা ফর্ম থাকে। আমি ভর্তি হয়েছি চতুর্থ ফর্মে। যা আমাদের বাংলা দেশের ক্লাস নাইনের সমান। পঞ্চম ফর্মের পরীক্ষা পাশ করলে 'O' লেভেল বা 'অর্ডিনারি' লেভেল পাশ করা হয়—যা আমাদের হায়ার সেকেণ্ডারির সমান। তারপর ষষ্ঠ ফর্ম পাশ করলে 'A' লেভেল বা অ্যাডভান্স লেভেল পাওয়া যায়।

প্রতিদিন সকাল নটা থেকে স্কুল আরম্ভ হয়। ছুটি হয় বেলা চারটেয়। চল্লিশ মিনিট করে এক-একটা ক্লাস হয়। প্রথমে চ্যাপেলে উপাসনা, তারপর শুরু হয় ক্লাস। দু-পিরিয়ডের পর আধ ঘণ্টার জন্যে বিরতি। পাঁচ পিরিয়ডের পর লাঞ্চ ব্রেক

একটা থেকে দু'টো। তারপর তিন পিরিয়ড হয়ে ছুটি।

পড়া বুঝতে কিছুটা অসুবিধে হচ্ছে। এর প্রধান কারণ পড়ানোর মাধ্যমটা ইংরেজি বলে।

এখানকার স্কুলে বছরে তিনটে করে টার্ম হয়। এক-একটা টার্ম তিন মাস করে। আমি ভর্তি হয়েছি সামার টার্মে। এই টার্মের শেষে দু-মাস গ্রীষ্মের ছুটি।

এখানে এখন ক্রিকেট খেলার সীজন। স্কুলে ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে দোসরা মে থেকে। এখানকার ছেলেরা ক্রিকেটের চেয়ে রাগফি খেলাই পছন্দ করে বেশি।

আমি যে স্কুলে পড়ি সেটা একটা প্রাইভেট স্কুল। এখানে একটা টার্মের মাইনে দেড়শো পাউণ্ড। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, বই-পত্তর। এ-সবের খরচ আলাদা। এখানে বেশির ভাগ অভিভাবকেরই প্রাইভেট স্কুলে পড়াবার সামর্থ্য নেই। তাই বেশির ভাগ ছেলেই কাউন্সিল স্কুলে পড়ে। এই স্কুলগুলো সরকারের সাহায্যে চলে, তাই পড়তে পয়সা লাগে না।

এখানে কতকগুলো নতুন বিষয় পড়ছি। সেগুলো আগে পড়ি নি। যেমন—কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, আর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। তা ছাড়া এখানে প্রায় প্রত্যেক দিন ল্যাবরেটরিতে যেতে হয়।

এখানকার স্কুলে পড়াশুনো ছাড়াও নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা—গান-বাজনা, খেলাধূলো। তা ছাড়া প্রত্যেককে একটা করে বিদেশী ভাষা শিখতে হয়।

এখানকার স্কুলগুলো বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলাভাবে তৈরি হয়। এক-একটা ক্লাসে পনেরো-কুড়ি জন ছেলে থাকে।

আজ এই পর্যন্তই। ইতি—

বোম্বের পথে যাদুকর

রমেশ মজুমদার

গোয়েন্দারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাকে খুঁজছে? কে? কলকাতার বিখ্যাত হীরক ব্যবসায়ী হরিচরণ বসাকের দোকান বালিগঞ্জে রাসবিহারী এ্যাভেন্যুতে। তার দোকান থেকে কতকগুলো মূল্যবান হীরক হারিয়েছে। যার দাম লাখ খানেক টাকা। মালিক থানায় খবর দিয়েছে।

হরিচরণবাবু রোজকার মত সেদিনও বেলা দশটায় খেয়ে দোকানে বসেছে। ছেলেরা ও অন্যান্য কর্মচারীরাও এসেছে। বসেছে সবাই নিজের চেয়ারে। এতবড় দোকান একা চালান সম্ভবপর নয়, তাই এত লোক।

ঠিক এগারোটার সময় এক ভদ্রলোক এলো হীরে কিনতে। দামী হীরে চাই তার। একটা আংটির জন্য, দু'টো চাই দুলের জন্য, আর একটা চাই হারের লকেটের জন্য, লকেটের জন্য একটু বড় হীরে চাই। আংটির হীরেটা একটু ছোট হলে চলবে। আর দু'টি দুলের হীরে আর একটু ছোট হওয়া চাই। প্রত্যেকটি আসল হীরে হওয়া চাই।

হরিচরণবাবু আগন্তুকের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলে। সত্যিই টাকার মানুষ বলেই মনে হয়। ধনী লোক। তাই বললে, হীরে যেমন খুশী তেমন পাবেন। কলকাতায় আমাদের এখানে ছাড়া ভাল হীরে কোথায় পাবেন? কেউ রাখে না।

এবার আগন্তুক বড় দু'টি একশো টাকার বাণ্ডিল কাউন্টারে রাখলো নিজের বড় ব্যাগ থেকে।

হরিচরণবাবু সেদিকে চেয়ে লোভ ছাড়তে পারলে না। দামী দামী হীরে বের করে তাকে দেখালো। ভদ্রলোক প্রত্যেকটি হীরে হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখলো। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে ভাল করে দেখে একটিমাত্র পছন্দ করলো। বড় হীরে। বেশ দ্যুতি বেরচ্ছে। হারের লকেটে বসানো চলবে।

আরো কয়েকটি দামী হীরে দেখালো দোকানদার। আগন্তুক ভদ্রলোক ভাল করে দেখে আরো তিনটে পছন্দ করলো।

হরিচরণবাবু এবার অন্যান্য হীরেগুলো বাক্সে রেখে দাম কষতে লাগলো। মোট আটানব্বুই হাজার সাতশ' টাকা হলো চারটে হীরের দাম। সবগুলোই দামী হীরে। অন্ধকারে আলো ছড়ায়।

ক্রেতা ভদ্রলোক এবার টাকার বাণ্ডিল দু'টি এগিয়ে দিলে দোকানের মালিক হরিচরণবাবুর সামনে। এক লাখ টাকা আছে। আপনার প্রাপ্য টাকা নিয়ে বাকীটা ফেরৎ দিন।

মালিক টাকাগুলো গুণে নিল। বাকী টাকা ফেরৎ দিলে ক্রেতাকে। তারপর ক্যাশমেমো কেটে নমস্কার জানালে। বললে, একটা কোকাকোলা খান।

—ধন্যবাদ! সময় নেই। চললাম।

—আবার আসবেন দয়া করে। হরিচরণবাবু হাত যোড় করে বললে।

—অবশ্যই আসবো।

ক্রেতা এবার হীরে চারটে ব্যাগে নিয়ে দোকানের বার হয়ে ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসলো। ট্যাক্সি চললো সোজা পথে।

এদিকে হরিচরণবাবু খুশীতে বলে উঠলো, যাক, আজ বসতে না বসতেই ভাল বিক্রী হলো। তিন হাজার টাকা লাভ হলো।

তারপর ছোট ছেলেকে বললে, তুই আর একবার টাকাগুলো গুণে সিন্দুকে রেখে দে খোকা। দৈনিক এমন একটি ক্রেতা পেলেই যথেষ্ট। কি বলিস?

ছোট ছেলে খোকা হাসলো। বড় ছেলে মণি বললে, রোজ এমন খদ্দের পেলে ব্যবসা চলবে, নইলে ক্রেতা কোথায়? ধনী লোক শহরে থাকলেও কেউ এসব আজকাল কেনে না। সৌখীন লোক যারা তারাই কেনে।

সহসা ছোটছেলের চোখ দু'টো ছানাবড়া হলো বাক্স খুলে। - বাবা, টাকা

কোথায়? এগুলো সব খবরের কাগজের টুকরো যে। দু'টো বাণ্ডিলই কাগজের টুকরো, টাকা নয়। সব ফাঁকি।

—বলিস কি। হরিচরণবাবু বাক্সের দিকে চেয়ে মাথায় হাত দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, যা-যা, ছোট্-ছোট্, খোঁজ, কোথায় গেল জোচ্চোরটা। যা গাড়ী নিয়ে সোজা পথে যা মণি। দেখতে পেলেই ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবি। খোকা তুই যা একটা ট্যাক্সি নিয়ে আর এক পথে। রবি, বদু তোরাও যা, ছোট্-ছোট্। আমি টেলিফোন করছি থানায়, তারপর লালবাজারে।

ছেলেরা সব ছুটলো 'প্রাইভেট কার' আর ট্যাক্সি নিয়ে। কারো কথা বলবার অবকাশ নেই। ছুটলো সবাই পথে পথে।

কর্মচারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দোকানের সামনে রাস্তায় এসে চারিদিকে লক্ষ্য করতে লাগলো, যদি সেই লোকটিকে দেখা যায়। যদি এপথে আবার যায়।

হরিচরণবাবু বললে, কি দেখছিস তোরা? সে কাছে পিঠে কোথায়ও নেই। এ নিশ্চয়ই যাদু জানে। নইলে জহুরীর চোখকে ধোঁকা দিয়ে পালালো। এতবড় ক্ষমতা।

তারপর থানায় টেলিফোন করে সব বললে। লালবাজারে টেলিফোন করে সব কথা জানালে। বললে, ধরে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো, কথা দিলাম।

থানার দারোগা এসে সব কথা লিখে নিয়ে গেল। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার এসে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। জেনে নিল সেই প্রতারকের আকার-আকৃতি এবং পোষাক।

হরিচরণবাবু হাত যোড় করে বললেন, হীরে চারটে উদ্ধার করে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।

গোয়েন্দা অফিসার বলে গেল যাবার সময়, লোকটা অবশ্যই যাদুকর। এমন একজন অসৎ যাদুকর কলকাতায় মাঝে মাঝে আসে এবং বহু টাকা আত্মসাৎ করে চলে যায় অন্য কোন সহরে। যাদুকররা কখনও প্রতারণা করে না, খেলা দেখিয়ে যশ অর্জন করে। এর উদ্দেশ্য যাদুর দ্বারা লুঠ করা। গোয়েন্দা বিভাগ এর বহু কাহিনী শুনেছে। দেখি কি করতে পারি। সম্ভবতঃ আজই এ কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে।

গোয়েন্দা অফিসার নিজের নাম এবং টেলিফোন নম্বর হরিচরণবাবুকে দিয়ে মালিকের নাম এবং টেলিফোন নম্বর লিখে নিয়ে চলে গেল।

এক ঘণ্টা পরে লালবাজার থেকে ফোন এলো, হরিচরণবাবু, এক্ষুণি লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে চলে আসুন। যাদুকরটি ধরা পড়েছে বামালসহ। দেরী করবেন না। দমদমে ধরা পড়েছে।

লাইন ছেড়ে দিতেই হরিচরণবাবু ব্যস্ত হলেন লালবাজারে যাবার জন্য। শুধু ঘরময় ছুটাছুটি করলেন।—একটা ছেলেই ফিরে আসুক! সেই যে গেছে কেউ ফিরছে না আর। আসামী ধরা পড়েছে। ওরা কখন আসবে? ভগবান! একি সমস্যা! দোকান ছেড়ে যে যেতেও পারছি না। ছেলেরাও ফিরছে না!

কপাল চাপড়াতে থাকে দোকানের মালিক হরিচরণবাবু। কর্মচারীরাও ঘর-বার করছে বার বার!

একটু পরে ছোট ছেলে এলো গাড়ী নিয়ে। হরিচরণবাবু বললে, লোকটা বামালসহ ধরা পড়েছে। লালবাজার থেকে ফোন করে জানালো, দমদমের পথে ধরা পড়েছে। চললাম, দোকানে বস। কোথাও যেয়ো না।

ব্যস! বেচারা গাড়ীতে উঠে ছুটলো লালবাজারের দিকে। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে তাড়াতাড়ি উঠে বললে, কোথায় সেই যাদুকর, স্যার? আমি এসেছি। সেই হীরক ব্যবসায়ী!

গোয়েন্দা অফিসার একজন তার সব কথা শুনে বললে, কেন, এইমাত্র আপনি ফোন করে বললেন, যাদুকরটাকে আপনি ধরে ফেলেছেন। ছেলেরা ধরে এনেছে তাকে। তাই আমাদের একজন অফিসার মিঃ মল্লিক আপনার দোকানের দিকে গেল গাড়ী নিয়ে।

হরিচরণবাবুর মাথা যেন ঘুরে উঠলো। বললো, আমি তো ফোন করি নি। আপনারাই আমাকে ফোন করে জানালেন—যাদুকর ধরা পড়েছে বমালসহ। এখুনি চলে আসুন। তাই এলাম।

—তাহলে! তাহলে কে এভাবে ধোঁকা দিল আমাদের এবং আপনাকে? তাহলে এটাও কি সেই যাদুরের কর্ম? এত সাহস?

—কি করে বলবো, স্যার!

—নিশ্চয়ই যাদুকর অন্য কোন জায়গা থেকে আমাদের এখানে এবং আপনাকে ফোন করে নাজেহাল করেছে। কি সাংঘাতিক!

—তাহলে আমি চলে যাবো, স্যার?

—নিশ্চয়ই যাবেন। যাদুকর জব্দ করেছে আমাদের দুই পক্ষকেই।

বিরস বদনে ফিরে চললো হরিচরণবাবু। মাথা তার ঘুরছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। কি করে যাদুকরকে ধরা যাবে? কেমন করে পাওয়া যাবে তার হীরে চারটে?

দোকানে গিয়ে দেখে লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসার বসে রয়েছে। হরিচরণবাবুকে দেখে বললে, কোথায় আপনার যাদুকর? বামালসহ ধরে ফেলেছেন তাকে, ফোন করে যে লালবাজারে আমাকে জানালেন?

—স্যার! আমি ফোন করি নি! বুঝতে পারছি না কে এভাবে আমাকে ফোন করে জব্দ করলো এবং আপনাকেও টেনে আনলো। আমাকে লালবাজারে যেতে বললো। বললো, এখুনি চলে আসুন, যাদুকর বমালসহ ধরা পড়েছে। গিয়ে শুনি সেখানেও ফোন করেছে আমার নাম করে, লোকটা ধরা পড়েছে, দোকানে আনা হয়েছে!

—হুঁ! বুঝেছি! যাদুকর! সে আমাদের জব্দ করেছে! ভেল্কী দেখাচ্ছে! দেখা যাক, আমিও তাকে জব্দ করতে পারি কি না! চলি।

গোয়েন্দা অফিসার চলে গেল। ঠিক তার একটু পরেই হরিচরণবাবুর টেলিফোন বেজে উঠলো। ফোন তুলে ধরতেই খবর পেল, যাদুকরের খবর পাওয়া গেছে। দমদমে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে আছে। সে প্লেনে উঠে চলে যাবে বোম্বে। কারণ সে একটি বোম্বের টিকিট কেটেছে। গোয়েন্দা অফিসার বলছি। যদি পারেন চলে আসুন।

ফোন ছেড়ে দিয়ে চিন্তা করতে লাগলো বেচারা। কি করবে সে? এও কি সেই যাদুকরের টেলিফোন? না কি গোয়েন্দা অফিসারের?

মাথায় হাত দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে ভাবতে থাকে হরিচরণবাবু।

সহসা গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এলেন গাড়ী নিয়ে। গাড়ী থেকে—নেবে দোকানে ঢুকেই কড়া ভাষায় বললে, ন্যাকামীর জায়গা পান নি? দোকানের কোন জিনিস চুরি যায় নি। কেবল মিছিমিছি আপনি আমার অফিসারদের

নাজেহাল করছেন। চলুন, আপনাকে এ্যারেস্ট করবো। আপনি মিথ্যাবাদী, প্রতারক!

ভয় পেয়ে গেল হরিচরণবাবু। তাড়াতাড়ি করে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরলো ডেপুটি কমিশনারের। বললে, স্যার! মিথ্যা কথা বলি নি। আপনি ক্যাশমেমো দেখুন, চারটে হীরে বিক্রী করেছি। টাকার বদলে দু' বাণ্ডিল কাগজ দিয়ে গেছে চোখে ধোঁকা দিয়ে। বিশ্বাস করুন, স্যার!

ডেপুটি আরো গালাগাল করে চলে গেল তাকে ছেড়ে দিয়ে। মালিক বেচারা বাঁচলো। মালও হারালো, আবার এ্যারেস্টও হতে হচ্ছিল। কি দুর্ভাগ্য! আর এক বিপদ! মহা সমস্যা!

ওদিকে লালবাজারে এক ঘণ্টা পরে দমদম বিমানঘাঁটি থেকে এক ফোন গেল, এক প্রতারক একটি বোম্বের টিকিট নিয়ে টাকার বদলে কাগজ দিয়ে গেছে। পরে সেটা নজরে পড়েছে। তখন প্লেন আকাশে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। ধরা পড়ে নি।

সহসা পুলিশ কমিশনার ডেকে পাঠালেন গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটিকে। ডেকে বললেন, এক যাদুকর নাকি আপনাকে মোটা টাকা দিয়েছে এবং এক হীরক ব্যবসায়ীর মূল্যবান হীরে হাতসাফাই করে পালিয়েছে।

—মিথ্যে কথা, স্যার! কে বলেছে? প্রমাণ করুন, স্যার! কোন মিথ্যা চক্রান্ত! কে বলেছে?

—আই-জি স্বয়ং বলেছেন।

—বেশ, সেই ব্যবসায়ীকে ফোন করে জেনে নিন, তার মতামত কি! আমি তাকে চিনিই না।

সহসা আই-জির ফোন এলো। তুলে ধরলেন কমিশনার,—বলুন, স্যার!

—একটু আগে টেলিফোন করে আমার সাথে বিদ্রূপ করছিলেন কেন? কৈফিয়ৎ চাই।

—মাফ করবেন, স্যার! আমি আজ আপনাকে ফোন করি নি। আপনি ঘণ্টাখানেক আগে যে আমাকে ফোন করে গোয়েন্দার ডেপুটির বিরুদ্ধে বললেন! তাছাড়া আমি কথা বলি নি।

—না, আমিও ফোন করি নি তো? আই-জি জবাব দিলেন।—একি কাণ্ড কে এসব করছে? শুনে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি বললেন, বুঝেছি! যাদুকর!

পরদিন সকালে কাগজে দেখা গেল রহস্যজনকভাবে যাদুকর বোম্বে নেবেছে, পরে প্লেন নিয়ে উধাও। সে-প্লেনের আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। যাত্রীদের শুধু বিমান-বন্দরে নাবিয়ে দিয়েছে। পাইলটদের সম্ভবতঃ সম্মোহন করেছে! আই-জি, ডি-আই-জিরা ব্যস্ত হয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন দিকে দিকে। যাদুকরের কথা সব কাগজে বের হলো। প্রত্যেক বিমান-বন্দর প্রত্যেক শহর কেঁপে উঠলো। যাদুকর! কিন্তু সে কোথায়? আবার কোনদিকে গেল?

ওদিকে হীরক ব্যবসায়ী পরে জানতে পেরেছে ডেপুটি কমিশনার তাকে এ্যারেস্ট করতে দোকানে যান নি এবং টেলিফোনও করেন নি। সব যাদুকরের খেলা।

পরদিন দুপুরে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদার্পণ ঘটলো হীরের দোকানে। এসে হরিচরণবাবুকে বললেন, আমি গোয়েন্দা ডেপুটি। এক চিঠি পেলাম, চারটে হীরেই নাকি আপনার বাক্সে রয়েছে। এই বাক্সে কাল টাকা রেখেছিলেন কি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ!

—দেখি আপনার ক্যাশ বাক্সটি। যার ভেতর টাকার বাণ্ডিল দু'টো রেখেছিলেন কাল।

এবার বাক্সটি এগিয়ে দিতেই গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি পেয়ে গেলেন হীরে চারটি।

হরিচরণবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

সেদিন সকালে দমদম বিমান বন্দরেও হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে গেল। সেই অপহৃত প্লেনটি রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত দেহে। পাইলট ভেতরে ঘুমিয়ে আছে।

সমগ্র কলকাতাবাসী বিস্মিত হলো যাদুকরের কাণ্ড দেখে! একি অসম্ভব যাদুবিদ্যা! এও সম্ভবপর! যাদুকরকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

আমি যাত্রীঃ জিনিভা

সুশীলকুমার গুপ্ত

পৃথিবীতে কোনো আশ্চর্য সুন্দর হ্রদের পাড়ে একটি মনোরম শহর কেউ যদি দেখতে চায় তবে তাকে জিনিভায় যেতে হবে। জিনিভাকে জার্মানেরা বলে, 'গেন্‌ফ্‌'। এর ফরাসী নাম 'জেনেহ্ব্‌'। জিনিভা সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী সভ্যতার কেন্দ্র।

জিনিভার সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক স্মৃতি জড়িত। শেলী, বায়রন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবিগণের অতি প্রিয় শহর এই জিনিভা। এই শহর অনেক অত্যাচারিতের আশ্রয়স্থান হিসাবেও সুবিদিত।

জগৎপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক রুশোর জন্মস্থান এই জিনিভা। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে রুশো জিনিভায় জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র ইওরোপের চিন্তাধারায় রুশোর প্রভাবের কথা কে না জানে। তিনি ছিলেন ইওরোপে রোমান্টিক আন্দোলন ও ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম অগ্রদূত এবং প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন নীতির উদ্গাতা। তাঁর 'দি সোসাল 'কণ্ট্রাক্ট', 'কনফেশনস', 'এমিল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অতুলনীয়। জিনিভা হ্রদের মধ্যে রুশোর নামে একটি সুন্দর দ্বীপ আছে।

জিনিভা হ্রদের রূপের তুলনা হয় না। এই হ্রদের স্থানীয় নাম লাক লেমা (Lac Leman) বা লেমাঁ হ্রদ। রোন নদী যেখানে হ্রদ থেকে বেরিয়েছে ঠিক সেই জায়গায় জিনিভা অবস্থিত। বাম ও দক্ষিণ উভয় তীরেই শহর। পুলের উপর দিয়ে এ তীর থেকে ও তীরে যাওয়া যায়।

জিনিভা পূর্বে লীগ অব্‌ নেশনসে বা জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল। বর্তমানে ইউনাইটেড নেশানস্‌ অর্গানাইজেশন বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনে বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সচিবালয় জিনিভায় অবস্থিত। এছাড়া জিনিভাতে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইণ্টার ন্যাশন্যাল রেডক্রশ সোসাইটি বা আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস থাকায় এর গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জিনিভার সঙ্গে আমার পরিচয় ফেব্রুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যাবেলায়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। এয়ার পোর্ট থেকে নেমে সিটি এয়ার অফিসে এলাম এয়ার কোম্পানির গাড়িতে। এখানে নেমে আমরা হোটেলের অনুসন্ধান

করলাম। ভ্রমণকারীদের হোটেল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে প্রত্যেক বিমান বন্দরের অফিসে একটি করে ইনফরমেশন অফিস বা তথ্যকেন্দ্র আছে। জিনিভার ইনফরমেশন অফিস আমাদের জন্যে 'হোতেল দে আলাপ' ঠিক করে দিলে। হোটেলটি রু দে আলপের উপর। আমরা কিছু রেখমার্ক (জার্মান মুদ্রা) ভাঙিয়ে ফ্রাঙ্ক (সুইশ মুদ্রা) নিলাম।

চমৎকার হোটেল। হোটেলের একটি সুন্দর ঘরে আস্তানা গাড়লাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে স্নান সেরে রেস্তরাঁর সন্ধানে বের হলাম।

কাছাকাছি খুব ভালো একটা নিরামিষ ভোজনালয় পাওয়া গেল। পোলোয়া ও কারির সহযোগে নৈশ ভোজনপর্ব শেষ করলাম। রান্না বেশ ভালো। ভ্রমণ-কারীদের সঙ্গে ব্যবহারে এখানকার লোকেরা খুবই অভ্যস্ত বলে যথেষ্ট সপ্রতিভ। ভোজনালয়টিতে কতকটা শৃঙ্খলার অভাব। পরিবেশন করতে লোকেরা বেশ সময় নিলে। পরিবেশনকারিণী আমরা যা চাইলাম তার জায়গায় অন্য জিনিষ এনে হাজির করেছিল। সে ইংরেজী একেবারেই বোঝে না। তারপর অন্য একজন এসে ব্যাপারটা ঠিক করে দিলে।

এখানেই দু'জন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হল। এদের মধ্যে একজন শিখ। ইনি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকরি করেন। কতকগুলি জিনিস কেনার ব্যাপারে আমেরিকা যাচ্ছেন। আমাদের কাছে ওখানকার আবহাওয়া খবরাখবর নিলেন। নিউ ইয়র্কে হোটেলের বিষয়েও জিজ্ঞাসা করলেন। বেরিয়ে যাওয়ার সময় করমর্দন করে বললেন—"আশা করি ভারতবর্ষে ফিরে আবার দেখা হবে।"

"কলকাতায় এলে এই ঠিকানায় আমাকে খোঁজ করতে পারেন।" বলে আমার একটি কার্ড ভদ্রলোকের হাতে দিলাম।

ভদ্রলোক বললেন—"আমি অফিসের কাজে মাঝে মাঝে কলকাতায় যাই। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

শিখ ভদ্রলোক চলে গেলে একজন সুদর্শন যুবক আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সে এতক্ষণ একা একা বসে ডিনার খাচ্ছিল। আমি তাকে ভারতীয় বলেই মনে করেছিলাম। যুবকটি হিন্দীতেই আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নিজের পরিচয় দিলে। যুবকটি বোম্বাইয়ের অধিবাসী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

গবেষণা করে। আমার সঙ্গী মিষ্টার যোশী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে কি কি দেখবার আছে, বলুন। তাছাড়া আমরা ঘড়ি কিনতে চাই। কোনখান থেকে কিনলে ভাল হবে?"

যুবকটি বললে—"এখানকার সবচেয়ে দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে জিনিভা হ্রদ। তারপরে আছে জাতিসংঘের পুরণো অফিস, মিউজিয়ম, আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থার সচিবালয় ইত্যাদি। তবে জিনিভা হ্রদের তুলনা হয় না। এখন তো খারাপ আবহাওয়া চলছে। কাল যদি ভাগ্যক্রমে রোদ পান তবে দেখবেন জিনিভা হ্রদ কি বস্তু! আর ঘড়ি সম্বন্ধে জানাচ্ছি। যে কোন বড় দোকান থেকে ঘড়ি কিনতে পারেন।"

যুবকটি অনেকদিন ভারতবর্ষে যায় নি। তাই সে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে। শেষে বললে—"বিদেশে থাকলে ভারতবর্ষের বিষয়ে প্রায় কোনো খবরই পাওয়া যায় না। কবে দেশে ফিরতে পারব ভাবছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধা বাইরে এতো বেশী যে অনেক সময় বাইরে না এসে উপায় নেই।"

যুবকটি আমাদের হোটেলের ঠিকানা নিলে এবং জানালে যে যদি সম্ভবপর হয় তবে সে পরের দিন আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।

পরের দিন সকালেই গেলাম জিনিভা হ্রদ দেখতে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সূর্যের আলোর দেখা নেই। হ্রদটা যেন একটা কুয়াশার চাদরে মুখ ঢেকে আছে। বিস্তৃত হ্রদের ধারে পাথরের নুড়িগুলো বৃষ্টিতে স্নান করছে। একদিকে হাঁসের মতো কয়েক ঝাঁক পাখি জলে ডুব দিয়ে দিয়ে খেলা করছে। হ্রদের কিনারে সারি দিয়ে বসার বেঞ্চি। সারিবন্দী সিক্যামোর (ডুমুর জাতীয় গাছ বিশেষ) গাছের ডাল কাটা। একটি পাতাও নেই। ডালের কাটা জায়গায় একটা অদ্ভুত স্ফীতি। হ্রদের মধ্যে স্থলভাগের অংশ মাঝে মাঝে জলে ঢুকে কিনারার সৌন্দর্য আশ্চর্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। বেঞ্চিগুলো খালি। একটি লোকও নেই। আমার সঙ্গী বললেন—"জিনিভা হ্রদ এতো ফাঁকা দেখব আশা করি নি।"

হ্রদের কাছেই জাতিসংঘের পুরণো অফিস। রাস্তার পাশে পাঁচিলের গায়ে একটি ফলকে জাতিসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের নাম খোদাই করা আছে। পুরণো প্রাসাদ। মিস্টার যোশী বললেন—"ভাবতে অবাক লাগে একদিন এইখানে সারা পৃথিবীর শান্তিকামী দেশসমূহের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হত।"

এবার হ্রদের উপরকার সেতু দিয়ে গেলাম শহরের পুরণো অঞ্চলে। এখানে একটি ছোট অথচ চমৎকার মিউজিয়ম আছে। মিউজিয়মটি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় অবস্থিত।

এরপর আমরা অপেরা হাউস, বুফে স্টেশন ইত্যাদি দেখে গেলাম আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থার সচিবালয়ের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে গেলাম। সচিবালয়ের বাড়িটি আধুনিক ধরণের। সামনের দীর্ঘ লনটি চমৎকার।

ডাকঘরে গিয়ে বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। আমার একজন সঙ্গী মিস্টার ব্যাস যেখানেই যান সেখান থেকেই তাঁর পাঁচ বছরের খোকার জন্যে বাড়ির ঠিকানায় একটি করে পিকচার পোস্টকার্ড পাঠান। বলেন—"এই চিঠি পেয়ে খোকা সকলকে দেখিয়ে বেড়াবে আর বলবে কি লেখা আছে পড়ে দিতে। খোকার তখনকার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা মনে করতে আমার খুব ভালো লাগে।"

প্রবাসে এই হয়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও বড় হয়ে ওঠে। স্মৃতিই তখন মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্গী।

জিনিভা আসার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে ঘড়ি কেনা। কত রকমের ঘড়ি তার ইয়ত্তা নেই। ঘড়ির দোকানের কর্মচারীদের অধিকাংশই মেয়ে। ঘড়ির দোকানে ঢোকে না এমন ভ্রমণকারীদের সংখ্যা বিরল। আমার একজন সঙ্গী তাঁর স্ত্রীর জন্যে রোলেক্স ঘড়ি কিনলেন।

এখানকার রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার। অনেক আলো রাস্তার উপর ঝোলানো।

হোটেলে ফিরলাম একেবারে লাঞ্চ খেয়ে। হোটেলে আমার ঘরের পিছনকার দৃশ্য দেখে খুব বেশী করে কলকাতার কথা মনে পড়ল। ছোট টালির চালের ঘরগুলো ঢেউ খেলিয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। হঠাৎ মনে হ'ল এইসব ঢেউয়ের উপর দিয়ে নৌকা করে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে যাই।

একটি কথা এখানে জানিয়ে রাখি। পৃথিবীতে বিমানে করে যত চিত্তাকর্ষক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফ্রাঙ্কফার্ট থেকে জিনিভা আসা। আর এর সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে হয় গোধূলি, নয় সকাল যখন সূর্য সবে তার ডানা মেলতে আরম্ভ করেছে। পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের স্তরে স্তরে সূর্যের আলোয় যে রূপের মায়াপুরী তৈরী হয় তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। আর অসম্ভব বলেই তাকে ভালো লাগার শেষ নেই।

———

খালি হাতে পয়সার আবির্ভাব

যাদুকর এ, সি, সরকার

কোথাও কিছু নেই, সম্পূর্ণ খালি হাত। মুঠো বন্ধ করে আবার যেইমাত্র হাতের তেলো খুলে ধরলে, অমনি তার ভেতরে আবির্ভূত হ'ল একটা চক্‌চকে সিকি।

কি মজা বলতো? সত্যি সত্যিই যদি এমনটি হ'ত! খালি হাতে পয়সার আবির্ভাব ঘটানোর ম্যাজিকটা প্রথমে আমি দেখাই ব্যাঙ্ককের এক কিশোর মজলিসে। কচি-কাঁচাদের সামনে আমার ডান হাতের তেলোটা মেলে ধরি। তারপরে হাত মুঠো করে ধরে শুরু করি ম্যাজিক-মন্ত্র পাঠ :—

এলাটিন বেলাটিন, মেলা টিন দালদা,
বুঁচি খাবে লুচি তাই নিয়ে যাই মালদা।
এক টিন চুরি গেল, বাকী টিন হারালো।
লুচি খেতে বুঁচি তাই, চাঁদে হাত বাড়ালো।

মন্ত্র পড়ে হাতের তেলো মেলে ধরতেই তো কচি-কাচার দল অবাক। হাতের তেলোর উপরে চক্ চক্ করছে একটি থাইল্যাণ্ডের ছোট মুদ্রা!

কেমন করে তোমরা খালি হাতে সিকি-র আবির্ভাব ঘটাবে বলছি শোন। ডান হাতের পেছন পিঠে বুড়ো আঙ্গুলের নখের নীচে এক ঢেলা মৌচাকের মোমের সাহায্যে সেঁটে রাখবে একটা চক্‌চকে সিকি। হাতের তেলো মেলে ধরলে পেছনে থাকার ফলে এ সিকি সামনে বসে থাকা দর্শকদের চোখে পড়বে না। (সাবধান, পেছনে যেন কেউ না থাকে) হাত মুঠো করার কাজটাও করবে খুব ক্ষীপ্র বেগে। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বুড়ো আঙ্গুলটা একবার মুঠোর মধ্যে ঢুকে সিকিটা রেখে বাইরে বেরিয়ে আসা চাই। অল্প অভ্যাস করলেই এই ক্ষীপ্রতা তোমাদের আয়ত্বে আসবে।

হকি এবং ভারত

মুকুল দত্ত

ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার জন্মকথা 'কলরব'-এর পাতায় তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। আমষ্টার্ডামে বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এ সংখ্যায় হকি খেলার জন্মকথা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

তার আগে বলে নিই, ওই আমষ্টার্ডাম থেকেই শুরু হয়েছিল হকি খেলায় আমাদের বিশ্ব অভিযান দীর্ঘ ৪৫ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে। অলিম্পিকে সর্বপ্রথম যোগ দিয়েই আমাদের ভারতের হকি খেলোয়াড়রা স্বর্ণপদক জয় করে ফিরে এসেছিল। তারপর থেকে হকি খেলায় আমাদের বিজয় বৈজয়ন্তী কোন দল আমাদের হারাতে পারে নি, কোন দেশ আমাদের কাছ থেকে সোনার পদক কেড়ে নিতে পারেনি। একটি দু'টি অলিম্পিকে জয় নয়, পর পর ছ'টি অলিম্পিকে আমরা বিজয়ী হয়েছি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য যদি ১৯৪০ এবং ১৯৪৪-এর অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ না থাকত তবে নিশ্চয়ই আমরা টানা আটটি অলিম্পিকে বিজয়ী হতাম। একদিকে বিশ্বহকিতে ভারতের এমন একাধিপত্য, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে বিশ্বহকিতে অজেয়; অপরদিকে ভারতের খেলোয়াড়দের খেলার কলা-কৌশল, কব্জির পেলবতা, ষ্টিক চালনার সৌন্দর্য এবং

যায়। এসব কারণে অনেকের ধারণা, হকি ভারতের জাতীয় খেলা, ভারতই হকির জন্মভূমি।

একেবারেই ভুল ধারণা। ব্রিটিশ শাসনের আগে, দূর অতীতে ভারতে কোনদিন হকি খেলা হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আর পাঁচ রকমের খেলার মত হকি খেলাও আমাদের দেশে এসেছে ব্রিটিশদের মাধ্যমে। ইংরেজ সৈন্যরাই আমাদের দেশে হকি খেলেছে। তাদের কাছ থেকে প্রথম দিকে খেলা শিখেছে ভারতীয় সিপাইরা। পরে হকি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

কবে, কোথায়, কোন্ দেশে হকি খেলা প্রথম শুরু হয়েছিল এবং কোন খেলা থেকে হকি খেলার অনুপ্রেরণা এসেছিল এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে গোলাকার কোন পদার্থকে হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা, সেই প্রবণতা থেকেই হকি খেলার সৃষ্টি এটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

শোনা যায় অতি প্রাচীনকালে পারস্য দেশে বাঁকা লাঠি দিয়ে বল চালিত করার এক রকমের খেলার প্রচলন ছিল। পারস্য থেকে ওই খেলা আসে গ্রীক দেশে এবং কালক্রমে গ্রীস থেকে যায় ফ্রান্সে। ফরাসীরা এই খেলাটিকে 'হকেট' নামে অভিহিত করে। ফরাসী ভাষায় 'হকেট' কথার অর্থ রাখালের লাঠি। ফ্রান্স থেকে খেলাটি যায় ইংল্যাণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ডই পরে সারা পৃথিবীতে এই খেলাটি ছড়িয়ে দেয় আইন কানুন তৈরী করে।

কিন্তু এইসব ভাসা ভাসা কথায় তো বোঝা গেল না হকি কতকাল আগে শুরু হয়েছিল! খেলার প্রামাণ্য নজীর কিন্তু আছে, পৃথিবীর শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে। এথেন্সের ভগ্নাবশেষ মন্দির গাত্রের এক খোদাই করা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৪২ সালে। খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশো বছর আগে থেমিষ্টোক্রেস নামক এক ভাস্করের তৈরী ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে দু'জন হকি খেলোয়াড় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হকি-ষ্টিক নিয়ে বুলি করছে। দু'জনের পেছনে হকি-ষ্টিক হাতে দাঁড়িয়ে আছে আর দু'জন খেলোয়াড়। তবে ওই বুলি করার ভঙ্গি ঠিক এখনকার খেলার বুলি করার মত নয়! ষ্টিক উল্টোভাবে হাতে ধরা, অর্থাৎ ষ্টিকের চওড়া দিকের মুখ মাটির দিকে। কিন্তু মন্দির গাত্রের ওই ভাস্কর্য থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না প্রায় আড়াই হাজার বছর কি তারও আগে থেকে হকি খেলা শুরু হয়েছে। হকি চিত্র খোদাই করা মন্দিরের ওই ভগ্নাবশেষ এখন কোপেনহেগেনের

জাতীয় মিউজিয়ামে রয়েছে। চিত্র খোদাই করা হয়েছে শ্বেত পাথরের উপরে। তৈরীর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৫১৪—৪৯৯। গ্রীক দেশের ভাস্কর্যে হকি খেলার আরও কিছু নিদর্শন ফুটে উঠেছে। সবই দু' আড়াই হাজার বছর আগের তৈরী। তাছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু কিছু ফরাসী চিত্র থেকেও প্রমাণ মেলে হকি পৃথিবীর বহু প্রাচীন খেলা।

শোনা যায় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে আয়ার্ল্যাণ্ডে 'হার্লি' নামে এবং স্কটল্যাণ্ডে 'সাল্টি' নামে হকির মতই এক রকমের খেলার প্রচলন ছিল। ইংল্যাণ্ডে হকি খেলা কিছুটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানত ব্ল্যাকহীথ ক্লাবের মাধ্যমে। ১৮৮৩ সালে লণ্ডনের উইম্বলডন হকি ক্লাব খেলার আইন কানুনে রূপান্তর ঘটিয়ে হকিকে ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয় করে তোলে। তার পরে আস্তে আস্তে হকি ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে।

তবে হকি ভারতের নিজের খেলা না হলেও হকির মধ্যে রূপ-রস-বর্ণ-ছন্দ আনার মূলে ভারত। ভারত অলিম্পিক হকিতে যোগ দেবার আগে মাত্র দু' বার হকি অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু সে খেলা ছিল একেবারেই সাদামাটা। না ছিল শিল্প নৈপুণ্য, না ছিল জৌলুষ। ভারতের খেলোয়াড়দের হাতের গুণেই হকির মধ্যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য এসেছে, হকি হয়ে উঠেছে আজ যাদুকরের যাদু।

ধাঁধা

নূতন ধাঁধা

[নিচের চিঠিখানিতে প্রথম '—' চিহ্নিত স্থানে যে কথাটি বসবে তার ঠিক পরেব ঐরূপ চিহ্নিত স্থানে সেই কথাটি উল্‌টিয়ে বসাতে হবে। যেমন প্রথম জায়গায় টাকা বসলে তার পরের জায়গায় বসবে কাটা। এভাবে চিঠিটি পূরণ করে দাও।]

ভাই—,

তুমি এ—খুব তাড়াতাড়ি আমার চিঠির জবাব দেবে আশা করি। সেদিন আমরা বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম।—গাছে উঠে মন্টু খুব—পেয়েছিল।—গাছের মাথা অবধি একটি—জড়িয়ে উঠেছে দেখলাম, বাগানে থাকতে থাকতে হঠাৎ বৃষ্টি—পড়ায়—বাড়ী ফিরে গেল। আজ শুনলাম সে—ভুগছে। শুনে দুঃখিত হবে আমার—টি ভেঙে গিয়েছে। ছুটিতে দাদা বাড়ী আসায় কাল মন্টু—এর দোকানে গিয়ে মাংস কিনে এনেছিল।—দাদার জন্য—র দোকান থেকে সুন্দর একটি—এনেছিল। দাদা আমাদের কাছে তিব্বতের—দের গল্প বলে খুব আনন্দ দিয়েছেন। সুচরিতা আজকাল বেশ এসরাজ বাজাতে পারে। কাল তা বাজাতে গিয়ে দেখে যে, কে তার বাক্স থেকে—নিয়ে গিয়েছে। কার এরূপ ছোট—হল বুঝা যাচ্ছে না। সুধীরার—কাল দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। হঠাৎ এই সময়ে একটা—ওঠে যে খুকী পড়ে গিয়েছে।—সে সময় তাকে ধরে ফেলে, দেখে যে তার হাতে একটি কাল '—' পড়েছে। কয়েকদিন আগে আমরা—নগরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পথে একটি—গ্রস্থ লোক দেখে মন্টু তাকে একটি টাকা দান করেছিল। নদীর তীরে একটি—দেখতে পেলাম। তার পাশেই একটি—শুনলাম উন্মাদদের সেখানে রাখা হয়। ফিরবার পথে একটি আশ্রমও চোখে পড়ল। সেখানে—বালকদের কর্তব্যপালনে—আগ্রহ দেখবার জিনিস। সম্প্রতি সাঁতারের প্রতিযোগিতায় আমাদের পাড়ার—দাদা—পার হয়ে একটি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে—ধন—ও পার হয়েছিল। তাদের এরূপ—দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তুমি—একথা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

চিঠি লিখতে অনেক দেরী হয়ে গেল। এখন পড়তে বসতে হবে। দেরী করলে দাদার কাছে—খেতে হবে। ইতি, তোমার—।

আষাঢ়ের ধাঁধার উত্তর :

১। ১৮৬২ সালে। ২। ফ্রেডারিকা বারবন্তী উচ্চতা ৩১০ ফুট ওজন ২২৫ মণ। ৩। ফ্লোরিণ। ৪। অসলো। ৫। বৈজ্ঞানিক জোসেফ্ প্রিসট্‌লি। ৬। 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট'। ৭। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। ৮। ১৮১৬ সালে অ্যাণ্টন হ্যাকেশ। ৯। নিউইয়র্ক শহরে। ১০। ৩৩,৮২০ বর্গমাইল।

শ্রাবণের ধাঁধার উত্তর :

১। কীর্তন ২। চা

প্রেরকের নাম .....

ঠিকানা .....

.....

.....